বাংলায় ভ্রমণ

—ঃ প্রথম খণ্ড ঃ—

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের
প্রচার বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

—১৯৪০—



মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

(ক) কলিকাতা—শিলিগুড়ি (কয়েকটি শাখা লাইন সমেত) ৬৫—১৭০

দমদম জংশন, বেলঘরিয়া, আগড়পাড়া, সোদপুর, খড়দহ, টিটাগড়, বারাকপুর, পলতা, ইছাপুর, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়া, নৈহাটী জংশন, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, শিমুরালি, চাকদহ, রাণাঘাট জংশন, মাঝেরগ্রাম, গোপালনগর, ফুলিয়া, শান্তিপুর, আড়ংঘাটা, মাজদিয়া, বাণপুর, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, পোড়াদহ জংশন, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, পাংশা, কালুখালি জংশন, রামদিয়া, বহরপুর, আড়কান্দি, নলিয়াগ্রাম, মধুখালি জংশন, কামারখালি ঘাট, বোয়ালমারি বাজার, ব্যাসপুর, ভাটিয়াপাড়া ঘাট, রাজবাড়ী, পাঁচুরিয়া জংশন, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, ভেড়ামারা জংশন, রায়তা, ঈশ্বরদি জংশন, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জবাজার, গোপালপুর, আবদুলপুর জংশন, নন্দনগাছি, সরদা রোড, রাজশাহী, খেতুর রোড, চাপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর, সান্তাহার জংসন, তিলকপুর, আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ (পাহাড়পুর), জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, হিলি, চরকাই, ফুলবাড়ী, পার্ব্বতীপুর জংশন, সৈয়দপুর, দরওয়ানি, নীলফামারি, ডোমার, হলদিবাড়ী, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, (দার্জ্জিলিংএর পথে, দার্জ্জিলিং ও দার্জ্জিলিংএর আশেপাশে)।

(খ) কলিকাতা—ডায়মণ্ডহারবার ও বজবজ, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা ... ... ১৭১—১৯৬

বালীগঞ্জ জংশন, মাঝেরহাট, নঙ্গী, বজবজ, যাদবপুর, গড়িয়া, সোণারপুর জংশন, ঘুটিয়ারী শরীফ, ক্যানিং, চাংড়িপোতা, মল্লিকপুর, বারুইপুর জংশন, ধপধপি, দক্ষিণ বারাশত, বহড়ু, জয়নগর-মজিলপুর, মথুরাপুর রোড, লক্ষ্মীকান্তপুর, মগরাহাট, বাসুলডাঙ্গা, ডায়মণ্ডহারবার (গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন)।

(গ) কলিকাতা—খুলনা—বাগেরহাট ... ... ১৯৭—২৪৬

দমদম গোরাবাজার, বারাসাত জংশন, মসলন্দপুর, গোবরডাঙ্গা, বনগ্রাম জংশন, বেনাপোল, ঝিকারগাছা ঘাট, যশোহর, সিঙ্গিয়া, চেঙ্গুটিয়া, নওয়াপাড়া, তালতলাহাট, দৌলতপুর, খুলনা, রূপসা ঈস্ট্, বাহিরদিয়া, যাত্রাপুর, ষাটগুম্বজ রোড, বাগেরহাট (খুলনা হইতে স্টীমার পথে প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ : চাঁদখালি, সাতক্ষীরা, কালিয়া, মহম্মদপুর, মাদারীপুর, পাটগাতি, হুলারহাট, ঝালকাঠি, বরিশাল)।

(ঘ) রাণাঘাট-লালগোলাঘাট-গোদাগাড়ীঘাট-কাটিহার ২৪৭—৩২৪

রীরনগর, কৃষ্ণনগরসিটি, দীঘনগর, আমঘাটা, নবদ্বীপঘাট (মায়াপুর), মুড়াগাছা, দেবগ্রাম, পলাশী, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর কোর্ট, কাশীমবাজার, মুর্শিদাবাদ, নশীপুর রোড, জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, লালগোলা, গোদাগাড়ী, আমনুরা জংশন, রোহনপুর, মালদহ (গৌড়), নিমাসরাই, আদিনা (পাণ্ডুয়া), শামশী, ভালুকা রোড, হরিশ্চন্দ্রপুর।

বাংলায় ভ্রমণ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বাংলার যে অংশ পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের দ্বারা সেবিত কেবল তাহারই বর্ণনা ছিল। তথাপি প্রথম মুদ্রণের তিন হাজার পুস্তক প্রায় তিন মাসের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় মুদ্রণের তিন হাজার পুস্তকও কয়েক মাসের মধ্যে বিক্রীত হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এই পুস্তকখানি বাংলাদেশের একটি বিশেষ অভাব অন্ততঃ আংশিকভাবে পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। "বাংলায় ভ্রমণ" নাম যাহাতে সার্থক হয় সে জন্য প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, অন্যান্য রেলপথের সহিত একযোগে সমগ্র বাংলার বিবরণসহ একখানি পুস্তক প্রণয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব-ভারত, বাংলা-নাগপুর ও আসাম-বাংলা রেলপথের সহযোগিতা লাভ করিতে পারায় বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে সমগ্র বাংলার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির যে যে অংশে বহু বঙ্গভাষাভাষীর বাস আছে এবং বাংলার সহিত যাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, বাঙালী ভ্রমণকারীর সুবিধার জন্য এই পুস্তকে তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইয়াছে। রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত রেলস্টেশন হইতে মোটরবাস, স্টীমার বা নৌকাযোগে যে সকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থানে যাওয়া যায় তাহাদের বিবরণও ইহাতে দেওয়া হইল।

কিংবদন্তীকে এই পুস্তকে সমধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পুরুষানুক্রমে যে সকল কাহিনী চলিয়া আসিতেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কিছু থাকুক বা না থাকুক, বাংলার সংস্কৃতির দিক্ হইতে তাহাদের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে এবং ভ্রমণকারীর নিকট এই সকল কাহিনী চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখও স্বভাবতঃই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বাদ-বিসম্বাদ বা মতভেদের প্রশ্ন এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। যাহাতে স্থান বিশেষ সম্বন্ধে ভ্রমণকারী নানা বিষয় জানিতে পারেন, সেজন্য সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, এরূপ মত বা অনুমানও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে ইহা একখানি সামান্য প্রদর্শিকা বা ভ্রমণ-পুস্তিকা মাত্র, আংশিক ভাবেও ইতিহাসের স্থলাভিষিক্ত ইহা নহে।

এই পুস্তকে বর্ণিত অধিকাংশ স্থানের বর্ণনা চাক্ষুষ দেখিয়া লেখা, এবং ইহার জন্য সরকারী জেলা-বিবরণী সমূহ, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রাচীন ও আধুনিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকাদির রচয়িতাদিগের নিকট রেলপথ-চতুষ্টয়ের পক্ষ হইতে গভীর ঋণ স্বীকার করিতেছি। কোনও কোনও উৎসাহী ও হিতৈষী ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থের জন্য

কিন্তু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। যে পুস্তকগুলি হইতে অল্পবিস্তর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

(১) বিভিন্ন জেলার সরকারী জেলা-বিবরণী সমূহ (ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়র)

(২)	বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(৩)	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন
(৪)	মধ্যযুগে বাঙ্গালা	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫)	নবাবী আমল	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
(৬)	বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস	দুর্গাচন্দ্র সান্যাল
(৭)	বৃহৎ বঙ্গ	ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন
(৮)	ফিরিঙ্গি বণিক	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
(৯)	বারভূঞা	আনন্দ চন্দ্র রায়
(১০)	চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস	বৃন্দাবন চন্দ্র পূততুণ্ড
(১১)	খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী	দুর্গাচরণ রক্ষিত
(১২)	প্রতাপাদিত্য	নিখিল নাথ রায়
(১৩)	কলিকাতা পরিচয়	প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন
(১৪)	The Second City of the Empire	Indian Science Congress.
(১৫)	নদীয়া কাহিনী	কুমুদ নাথ মল্লিক
(১৬)	ফরিদপুরের ইতিহাস	আনন্দ চন্দ্র রায়
(১৭)	পাবনার ইতিহাস	রাধারমণ সাহা
(১৮)	বগুড়ার ইতিহাস	প্রভাস চন্দ্র সেন
(১৯)	যশোহর-খুলনার ইতিহাস	সতীশ চন্দ্র মিত্র
(২০)	মুর্শিদাবাদের ইতিহাস	নিখিল নাথ রায়
(২১)	মুর্শিদাবাদ কাহিনী	নিখিল নাথ রায়
(২২)	গৌড়ের ইতিহাস	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
(২৩)	কোচবিহারের ইতিহাস (ইংরেজী)	কালিকা প্রসাদ দত্ত
(২৪)	Darjeeling and Its Mountain Railway	D. H. Ry. Co.
(২৫)	ঢাকার ইতিহাস	যতীন্দ্র মোহন রায়
(২৬)	ময়মনসিংহের ইতিহাস	কেদার নাথ মজুমদার
(২৭)	ত্রিপুরার ইতিহাস	কৈলাস চন্দ্র সিংহ
(২৮)	শ্রীহট্টের ইতিহাস	অচ্যুত চরণ চৌধুরী

(২৯) হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস — বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

(৩০) বীরভূমের ইতিহাস — গৌরীহর মিত্র

(৩১) মেদিনীপুরের ইতিহাস — যোগেশ চন্দ্র বসু

(৩২) তমলুকের ইতিহাস — ত্রৈলোক্য নাথ পাল

(৩৩) বিষ্ণুপুরের ইতিহাস — অভয়পদ মল্লিক

(৩৪) বাঙ্গালীর বল — রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

(৩৫) আমরা বাঙ্গালী — হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

(৩৬) Archaeological Survey of India No. 55 Excavations at Paharpur, Bengal. — Rai Bahadur K. N. Dikshit

(৩৭) The Changing Face of Bengal — Dr. Radhakamal Mukerjee.

(৩৮) Folk Art of Bengal — Ajit Coomar Mookerjee.

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগের শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় এই গ্রন্থ সঙ্কলনে অক্লান্তভাবে ও নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সরকারী কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত ছিল না। বাংলাভাষার প্রতি মমতা বশতঃই তিনি আনন্দের সহিত তাঁহার অবসর সময়ের বহুভাগ পুস্তকটির প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তক পাঠে যদি বাঙালীর নিজের ঘরের খবর লইবার কিছু আগ্রহ ও উৎসাহ হয়, তাহা হইলে এই উদ্যম সার্থক হইবে।

উপসংহারে বিনীত নিবেদন এই যে পুস্তকখানিতে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটী বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া সে সকল পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের পাব্‌লিসিটি অফিসারের গোচরে আনয়ন করেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে "বাংলায় ভ্রমণ"কে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা সহজ হইবে। এবিষয়ে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের অকুণ্ঠিত সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা রাখি।

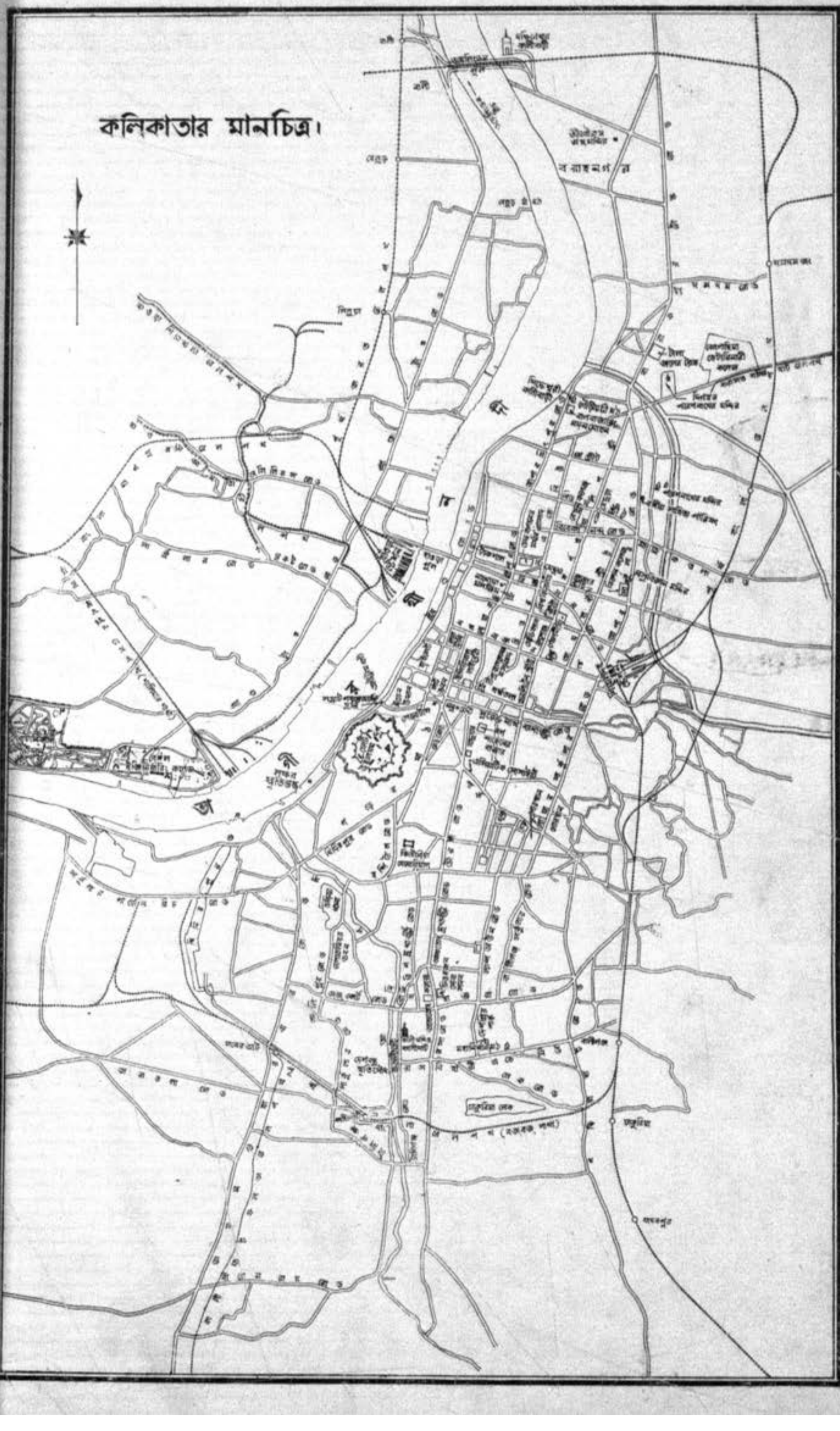
পুস্তকটির মুদ্রণকালে ইউরোপ মহাদেশে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ আর্ট পেপারের অভাব ঘটে; সেজন্য ইহাকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিতে হইল এবং পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের উত্তর বিভাগের কিয়দংশ ও ঢাকা বিভাগ এবং অপর তিনটি রেলপথের বিবরণ সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ডটি অন্য কাগজে ছাপিতে হইল।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ, প্রচার বিভাগ,
৩ কয়লাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা।
১লা মার্চ্চ ১৯৪০।

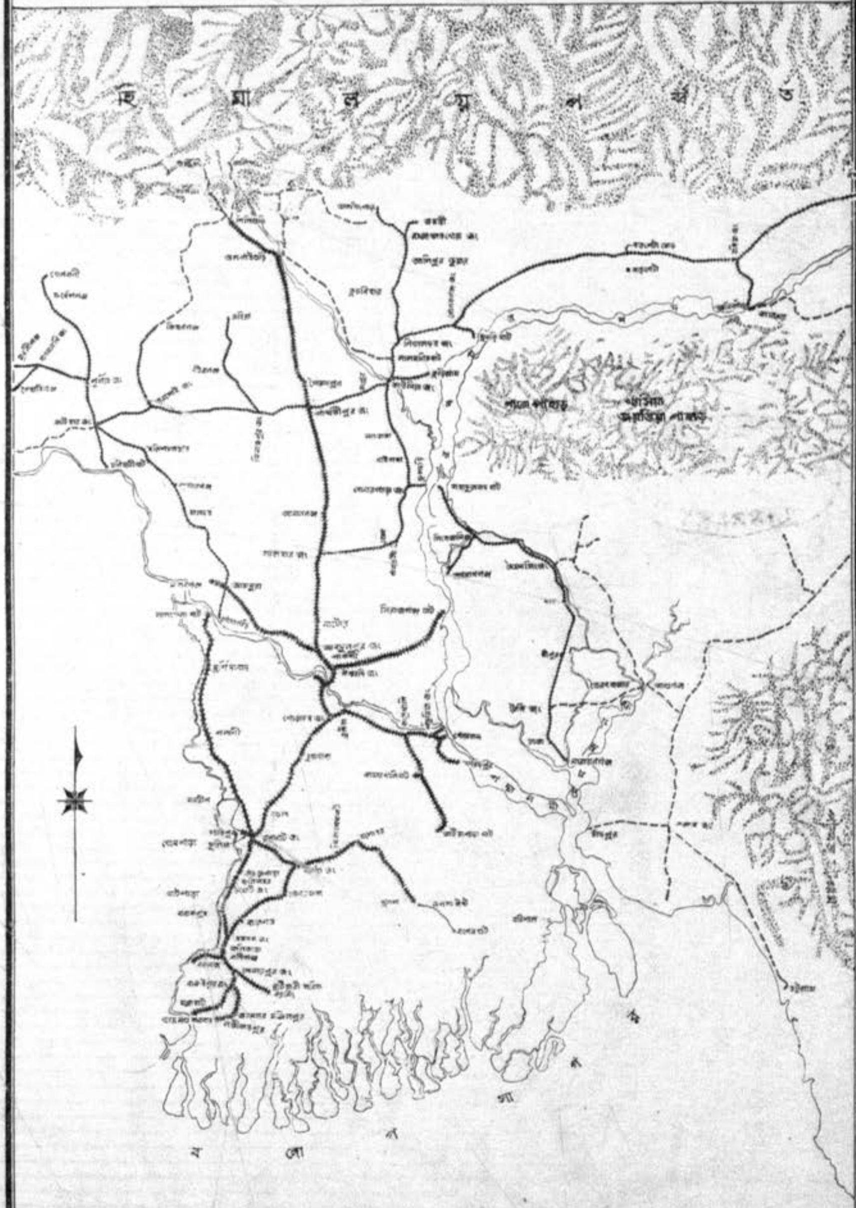
অমিয় বসু
সম্পাদক।

বাংলার মানচিত্র।

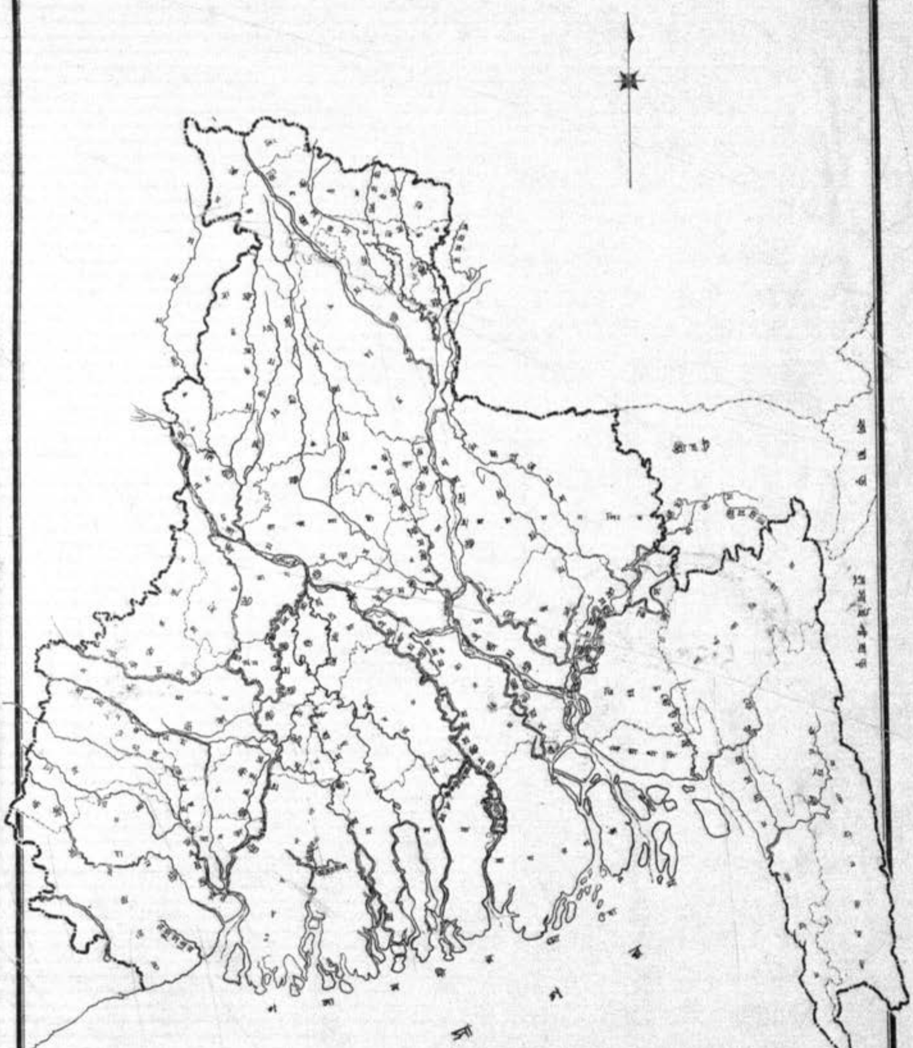

হি মা ল য় প র্ব ত
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
দিনাজপুর
রংপুর
মালদহ
বগুড়া
ময়মনসিংহ
রাজসাহী
মুর্শিদাবাদ
পাবনা
বীরভূম
নদীয়া
ঢাকা
পার্বত্য ত্রিপুরা
ত্রিপুরা
বর্দ্ধমান
বাঁকুড়া
যশোহর
ফরিদপুর
নোয়াখালি
হুগলী
হাবড়া
বাখরগঞ্জ
মেদিনীপুর
২৪পরগণা
খুলনা
ব ঙ্গো প সা গ র


কলিকাতার মানচিত্র।

পূর্ব্ব বঙ্গ রেলপথের মানচিত্র।



নদীমাতৃকা বাংলা



বাংলার সাধারণ পরিচয়

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ—বাংলা বা বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের অনুগামী ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়নসূত্র, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও বহু উপপুরাণে, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে, কালিদাসকৃত রঘুবংশে এবং বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরণ্যক, সূত্র ও সংহিতা গ্রন্থে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় যে তৎকালে বাংলাদেশে আর্য্য সমাগম হয় নাই। রামায়ণের যুগে বঙ্গদেশ ধনধান্য সমন্বিত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। মহাভারতের সময়ে বঙ্গদেশ কতকগুলি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎকালীন পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গের রাজা পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও বাহুবলের কথা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতির অন্যতম পুত্র অনুর বংশে বলিনামে এক সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দীর্ঘতমা গৌতমের বরে বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামক পরাক্রমশালী পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উত্তরকালে এই পঞ্চভ্রাতার নামে ভারতের পাঁচটি জনপদের নামকরণ হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক বিভাগ অনুসারে অঙ্গদেশের অবস্থান বিহারের ভাগলপুর বিভাগে, বঙ্গের বর্ত্তমান বাংলার ঢাকা বিভাগে, কলিঙ্গের দক্ষিণ ওড়িষ্যায়, সুহ্মের রাঢ়দেশ বা বর্দ্ধমান বিভাগে এবং পুণ্ড্রের অবস্থান উত্তরবঙ্গ বা রাজশাহী বিভাগে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কালিদাস ও মেগাস্থিনিসের বর্ণনা—মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশীয় নৃপতিগণ বহু রণতরী লইয়া রঘুরাজের সহিত জলযুদ্ধ করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্রের পূর্ব্বভাগে ও গঙ্গার পশ্চিম তীরে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ় নামক একটি বৃহৎ ও পরাক্রমশালী জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে মেগাস্থিনিস্ বর্ণিত গঙ্গারিডি বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ বা রাঢ়দেশ হইতে অভিন্ন। মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন যে গঙ্গারিডি দেশে বহুসংখ্যক দুর্ব্বার হস্তিবাহিনী থাকার জন্য এই দেশ কখনও বৈদেশিকগণের দ্বারা বিজিত হয় নাই। বীরকেশরী আলেক্জাণ্ডার সমগ্র এসিয়া জয় করিয়াও দুর্দ্ধর্ষ গঙ্গারিডিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে উল্লেখ—সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে "রালরট্ঠ" বা রাঢ়দেশের সিংহপুরে বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। জৈনদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ "আয়ারঙ্গ সুত্ত" বা আচারাঙ্গসূত্রে উল্লিখিত আছে যে জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান স্বামী "লাঢ়" বা রাঢ়দেশে

দ্বাদশবর্ষ বাস করেন। উত্তরকালে রাঢ়দেশ দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। অজয়নদের উত্তরপ্রদেশ উত্তররাঢ় এবং দক্ষিণ বিভাগ দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত ছিল।

গৌড় নামের প্রসিদ্ধি—এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া বাংলার প্রায় অধিকাংশ ভূভাগ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। রাজধানী গৌড়ের সমৃদ্ধি হইতেই সমগ্র দেশ গৌড় নামে আখ্যাত হইয়াছিল। পাণিনিসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ, মহাকবি ভারতচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, এমন কি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলা দেশকে বুঝাইতে গৌড় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বিভিন্ন যুগের বিভাগ—বর্ত্তমানে বাংলাদেশ বলিতে যে ভূভাগকে বুঝায়, তাহার সমগ্র এবং তৎসন্নিহিত কোন কোন অঞ্চল পূর্ব্বকালে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গরাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক যুয়ান্ চোয়াঙ্ ভারত পর্য্যটন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে বঙ্গরাজ্য কামরূপ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি এই পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল। শশাঙ্ক কামরূপ জয় করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি বল্লালসেন মিথিলা জয় করেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গরাজ্য মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ), বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ), বগড়ি বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ) এই পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসনকালে মুঘলযুগে সুবে বাংলা সাতগাঁ, খলিফাতাবাদ, মামুদাবাদ, ফতেহাবাদ প্রভৃতি আঠারটি সরকার বা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাংলাদেশ বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ বিভাগে মোট ২৭টি জেলা আছে। এই সকল জেলা খাস্ ইংরেজ সরকারের অধীন। ইহা ছাড়া উত্তরবঙ্গে কোচবিহার ও বাংলার পূর্ব্বসীমান্তে ত্রিপুরা এই দুইটি দেশীয় রাজ্য আছে।

বর্ত্তমান আসাম ও বিহার প্রদেশের সহিত বাংলার কিছু কিছু অংশ যথা শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, মানভূম জেলা ও সিংহভূমের ধলভূম পরগণা প্রভৃতি সংযুক্ত আছে।

সীমা ও বর্গফল—বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক বাংলার উত্তরে নেপাল, সিকিম, ভুটান ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা এবং গারো পাহাড়; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে বিহার ও ওড়িষ্যা; এবং পূর্ব্বদিকে আসামের শ্রীহট্ট জেলা ও লুসাই পাহাড়।

বাংলাদেশ উত্তর দক্ষিণে লম্বা। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণ প্রায় চারি শত মাইল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি প্রায় ৩৭৫ মাইল। ইহার সমগ্র পরিমাণফল প্রায় ৮৩ হাজার বর্গ মাইল।

প্রাকৃতিক গঠন—বাংলাদেশ একটি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। ইহার দক্ষিণ দিক ভিন্ন অপর তিন দিক পাহাড়ের প্রাচীরে বেষ্টিত। উত্তরদিকে হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া জলপাইগুড়ি জেলা পর্য্যন্ত আসিয়াছে; গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় ময়মনসিংহ জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পশ্চিমদিকে ছোট নাগপুরের মালভূমি বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ও রাজমহল পাহাড় বীরভূম জেলার মধ্য পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ওড়িষ্যার পাহাড় শ্রেণী অবস্থিত। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ, রাজশাহীর উত্তরাঞ্চল, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মালদহ জেলার পূর্ব্বাঞ্চল ব্যাপিয়া অবস্থিত একটি উচ্চ ভূভাগ দৃষ্ট হয়। ইহা "বরিন্দ্" (উচ্চভূমি) বা বরেন্দ্র নামে পরিচিত। ইহার মৃত্তিকা সাধারণতঃ লাল ও স্থানে স্থানে হরিদ্রা রঙের এবং কঙ্করময়। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে বাংলাদেশের এই অঞ্চল অন্যান্য স্থানের তুলনায় বহু প্রাচীন।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনার মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রায় দুইশত মাইল বিস্তৃত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপ নামে পরিচিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তনের ফলেই এই সমতল চরভূমির উদ্ভব হইয়াছে। এই ভূখণ্ডে বহু নদী নালা ও খাল বিল প্রভৃতি আছে। বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নবীন বলিয়া বিবেচিত হয়। বাংলার রাজধানী কলিকাতা এই গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই "ব" দ্বীপের প্রাচীন নাম বকদ্বীপ বা বগড়ি।

অরণ্য—বাংলার দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল দিয়া গঙ্গা ও মধুমতী এই দুই নদীর মোহনার মধ্যে প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ এক গভীর অরণ্য অবস্থিত। এই অরণ্য সুন্দরবন নামে পরিচিত। ইহার প্রস্থ স্থানভেদে ৬০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত। এই অরণ্যে সুঁদরী, গরাণ, ওড়া, বচ, পশুরি প্রভৃতি গাছ পাওয়া যায়। গোলপাতা ও হোগলাও এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই অরণ্যের ভূমি অতি নিম্ন ও বহু খাল, নালা ও নদীর দ্বারা পরিপূর্ণ। জোয়ারের সময় ইহার নিম্নপ্রদেশ জলপ্লাবিত হইয়া যায়। এই অরণ্যে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ, শূকর, হরিণ ও নানাজাতীয় অজগর ও সর্প প্রভৃতি বাস করে। ইহার নদীনালাতে বহু কুমীর দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ জন্তু। সমগ্র জগতে "রয়াল বেঙ্গল টাইগার" নামে এই বাঘ সুপরিচিত। সুন্দরবনের উত্তরাঞ্চলে ক্রমশঃ লোকের বসবাস ও চাষ-আবাদ হইতেছে। সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অরণ্যের নাম মধুপুরের জঙ্গল। এই জঙ্গল ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। এই জঙ্গলেও বহু হিংস্র প্রাণী বাস করে। এই জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে গজারি কাঠ, মধু ও মোম সংগৃহীত হয় এবং এখানে বহু ভেষজ তৃণলতাদি পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চল অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশস্থ ভূভাগও অরণ্য সমাবৃত ও হিংস্র জন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ।

নদনদী—বাংলা নদী মাতৃক দেশ। এই দেশের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক নদ নদী ভারতের আর কোন প্রদেশেই নাই। বাংলা দেশের নদ নদীর মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা সর্ব্বপ্রধান। এই নদীত্রয়ের গতি পরিবর্ত্তনের সহিত বাংলার বহু স্থানের উত্থান ও

পতনের ইতিহাস বিজড়িত। গৌড়, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, হুগলী প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী জনপদগুলির ভাগ্য গঙ্গা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই তিনটি নদীর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পদ্মা ও ভাগীরথী :—হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া রাজমহলের অনতিদূরে মালদহ জেলার পশ্চিম অংশে বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করিয়াছে। মালদহ জেলা হইতেই গঙ্গা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একভাগ দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপরভাগ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গার পূর্ব্বধারার নাম পদ্মা এবং পশ্চিমধারার নাম ভাগীরথী। পদ্মার ন্যায় প্রবলস্রোতা নদী অতি অল্পই আছে। এই পদ্মার ভাঙ্গা-গড়ার খেলার ফলে বহু প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থানের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভের বহু কীর্ত্তি নাশ করিয়া ঢাকা জেলায় পদ্মা কীর্ত্তিনাশা আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হওয়ার পরও এই সম্মিলিত জলস্রোত "পদ্মা" নামে পরিচিত হইয়া চাঁদপুরের নিকট মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই নদীত্রয়ের সম্মিলিত জলরাশি মেঘনা নামে পরিচিত। পদ্মার উপনদী সমূহের মধ্যে পাগলা, মহানন্দা, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ ও চন্দনা নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গার মূল প্রবাহ হইতে পৃথক্ হইয়া ভাগীরথী (হুগলী নদী) মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে সাগরদ্বীপের নিকটে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ স্থান ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত।

ভাগীরথীর মোট দৈর্ঘ্য ৩২০ মাইল। ইহার উপনদী সমূহের মধ্যে নদীয়া জেলায় ভৈরব, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণি; বর্দ্ধমান জেলায় অজয়, ব্রাহ্মণী, বাবলা, খাড়ি ও বাঁকা; হুগলী জেলায় বেহুলা, কাণানদী, কুন্তী ও বৈদ্যবাটী খাল এবং হাওড়া জেলায় দামোদর ও রূপনারায়ণ নদ উল্লেখযোগ্য। ত্রিবেণীর নিকট হইতে যমুনা ও সরস্বতী নদী গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়া যথাক্রমে ২৪ পরগণা এবং হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই দুইটি নদীই এখন ক্ষীণস্রোতা হইয়া খালের আকারে পরিণত হইয়াছে। নিম্ন বা দক্ষিণ অংশে যমুনা নদীর প্রবাহ খরতর দেখা যায়, কিন্তু সরস্বতী নদীর প্রায় সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। হাওড়া জেলার সাঁকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী ভাগীরথীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র :—ব্রহ্মপুত্র নদ পৃথিবীর বৃহত্তম নদনদীগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ মাইল। তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবর এই নদের উৎপত্তি স্থান। হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া এই নদ ডিব্রুগড় জেলার মধ্য দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে এবং ধুবড়ী শহর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে রংপুর জেলার উত্তর পূর্ব্ব

কোণ দিয়া বাংলা দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই নদ রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার পূর্ব্ব প্রান্ত এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত। বগুড়া জেলার মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশ প্রবাহিত উহা স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট "দাওকোবা" নামে পরিচিত। পাবনা জেলার সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদ পুরাতন খাত ত্যাগ করিয়া এক নূতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই খাতের নাম যমুনা বা নূতন ব্রহ্মপুত্র। এই নূতন প্রবাহ গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিশিয়াছে এবং পুরাতন প্রবাহ ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া ভৈরববাজারের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার উপনদী সমূহের মধ্যে তিস্তা (ত্রিস্রোতা), করতোয়া ও আত্রাই (আত্রেয়ী) উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র নদ বহুবার খাত পরিত্যাগ করায় এবং সেই সকল খাত উর্ব্বরা পলিমাটির দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষ শস্য সমৃদ্ধ হইয়াছে।

তিস্রোতা বা তিস্তা নদী বহুবার গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ইহার পুরাতন খাতগুলি স্থান বিশেষে ছোট তিস্তা, বুড়ী তিস্তা ও মরা তিস্তা নামে পরিচিত। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই সকল খাতে নৌকা চলাচল করিতে পারে না। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ জল প্লাবনের ফলে তিস্তা ও আত্রাই নদীর গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং পূর্ব্বে যে স্থান দিয়া নদী প্রবাহিত ছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত একরূপ লোপ পাইয়া যায়।

মেঘনা—সুরমা ও বরাক নামে পরিচিত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার দুইটি নদীর মিলিত স্রোত ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভৈরববাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে এবং ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার প্রান্তদিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। মেঘনার উপনদী সমূহের মধ্যে শীতলাক্ষী, বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, তিতাস ও ডাকাতিয়া নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিনটি নদীকে বাংলা দেশের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিমালয় পর্ব্বত হইতে পলিমাটি বহন করিয়া আনিয়া ইহারা সমগ্র বঙ্গদেশকে ঋদ্ধিমান করিয়া তুলিতেছে। বাংলা দেশ যে "সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা" সে শুধু এই নদীত্রয়ের জন্য।

অন্যান্য নদনদী—পূর্ব্বে যে সকল নদনদীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া বাংলাদেশে ছোট বড় আরও প্রায় শতাধিক নদনদী আছে। তাহাদের মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগে দারুকেশ্বর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী, কাঁসাই, শিলাই ও সুবর্ণরেখা; প্রেসিডেন্সি বিভাগে বিদ্যাধরী, পিয়ালী, ইছামতী, রূপসা, রায়মঙ্গল, কপোতাক্ষ, মালঞ্চ, কুমার, নবগঙ্গা ও চিত্রা; রাজশাহী বিভাগে বড়াল, টাঙ্গন, কালিন্দী, পুনর্ভবা, কুলিক, কাঞ্চন, ধরলা ও মহানদী; ঢাকা বিভাগে কীর্ত্তনখোলা, বলেশ্বর, ঝিনাই ও মগরা, এবং চট্টগ্রাম বিভাগে কর্ণফুলি, শঙ্খ, মাতামুড়ী, ফেনী, ও গোমতী উল্লেখযোগ্য নদনদী।

জলজন্তু ও মৎস্য—বাংলা দেশের প্রায় অধিকাংশ নদীতে কুম্ভীর, শুশুক, কচ্ছপ ও মৎস্যাদি বাস করে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীগুলিতে সময়ে সময়ে হাঙ্গরের দৌরাত্ম্য হয়। নদীজাত মৎস্যগুলির মধ্যে রুই, কাতলা, চিতল, ভেটকি, ইলিশ, চিংড়ি, পারশে প্রভৃতি মাছ সমধিক বিখ্যাত। পদ্মা ও ভাগীরথী নদীতে প্রতিবৎসর বহু ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। বিল ও জলাশয়ে জাত মৎস্যের মধ্যে কই, মাগুর, শিঙ্গি, খয়রা, শোল, টেংরা ও নাড়ুস মাছ প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক।

পশুপক্ষী ও সরীসৃপ—বাংলা দেশের বন্য পশুর সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গরু, মহিষ, ঘোড়া, প্রভৃতি সাধারণ গৃহপালিত পশু ভিন্ন উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থানে লোকে হাতী পুষিয়া থাকে এবং মালদহ, দিনাজপুর ও বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে বিস্তর হনুমান ও বানর দেখা যায়। পল্লীগ্রামের জঙ্গলে খট্টাস, খরগোস, সজারু, নেউল, কাটবেড়ালী, শৃগাল, গো-সাপ ও নানাজাতীয় সাপ বাস করে। বাংলার বিষধর সর্পগুলির মধ্যে কেউটিয়া, গোক্ষুর, রাজসাপ ও উদয়কাল প্রভৃতি প্রধান। ময়াল, চন্দ্রবোড়া, চিতি, দাঁড়াস, ঢোঁড়া ও অন্যান্য জাতীয় সাপও বাংলা দেশে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

কাক, চিল, শকুনি, সিঞ্চান, বাজ, পেচক, শালিক, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, পারাবত, ঘুঘু, চড়ুই, টিয়া, ময়না, ফিঙা, চাতক, মাছরাঙ্গা, বৌকথাকও, "গৃহস্থের খোকা হোক" প্রভৃতি, বহু প্রকারের পাখী বাংলা দেশে দৃষ্ট হয়। দোয়েল ও মাছরাঙাকে বাংলা দেশের নিজস্ব পাখী বলিতে পারা যায়। প্রাতঃকালে দোয়েল পাখীর সুমিষ্ট স্বরে গান বাংলা দেশের বাহিরে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। বাংলার বিলে ডাহুক, জলপিপি, বিলহাঁস, কোড়া, কাণ প্রভৃতি নানাজাতীয় পাখী বাস করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যাযাবর পাখী; বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বাংলায় আসে এবং বর্ষার অন্তে অন্যত্র চলিয়া যায়।

বৃক্ষ ও ফলপুষ্প—বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানের মৃত্তিকা আর্দ্র ও সরস। সুতরাং এই প্রদেশে বৃক্ষাদিকে বিশেষ সতেজ দেখা যায়। বাংলার অরণ্যভূমিতে জাত বৃক্ষাদির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রাম্য বৃক্ষাদির মধ্যে অশ্বত্থ, বট, দেবদারু, তেঁতুল, বেল, আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, খেজুর ও সুপারির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশের ঝাড় বাংলা দেশের বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার পার্ব্বত্য অঞ্চলের সন্নিহিত ভূভাগে বহু শাল, সেগুণ ও শিশুগাছ জন্মে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তর মহুয়া গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় নদীর চরভূমিতে বিস্তর বাবলাগাছ জন্মে। বিল ও জলাভূমির বহুস্থানে পদ্ম ও শালুক ফুটিয়া থাকে। কলমীলতার ফুলও জলজ পুষ্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্থলজ পুষ্পের মধ্যে স্থলপদ্ম, শিউলি, জুঁই, মালতী, গাঁদা, দো-পাটি, করবী, চাঁপা, গোলাপ, গন্ধরাজ, টগর, বেল, মল্লিকা, বকুল ও জবা প্রভৃতি প্রধান পর্য্যায়ে পড়ে। স্থলপদ্ম ও শিউলি বাংলা দেশের নিজস্ব ফুল।

বাংলার ফলের মধ্যে নারিকেল প্রথম স্থান অধিকার করে। আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, কলা, বাতাবী লেবু, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতিও বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

খনিজ দ্রব্য—বাংলার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লাই সর্ব্ব প্রধান। বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল ও রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অংশেও কয়লার খনি আছে। তাহা ছাড়া বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ ও রাইপুর থানার এলাকায় অভ্র ও অল্প পরিমাণে তাম্র পাওয়া যায়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার পাহাড় অঞ্চলে লৌহ, প্রস্তর ও ঘুটিং যথেষ্ট পরিমাণে মিলে।

কৃষিজাত দ্রব্য—বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের অধিবাসিগণের প্রতি চারিজন লোকের মধ্যে তিনজন কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা আনিত পলিমাটির দ্বারা বাংলাদেশের ভূমি সকল বিশেষ উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সকল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মে। বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান ও পাট সর্ব্ব প্রধান। ধান বাংলার প্রায় সকল জেলাতেই জন্মে। পলি-পড়া সরস ভূমি ও গরম বাতাস পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা ও রংপুর জেলার আবহাওয়া অনেকটা এইরূপ হওয়ার দরুণ ঐ সকল জেলাতে বিস্তর পাট জন্মে। পৃথিবীর সকল দেশের পাটের চাহিদা একমাত্র বাংলা দেশই মিটায়। বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও পাটের চাষ হয় না বলিলেই চলে। বাংলাদেশ হইতে প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকার পাট বিদেশে চালান যায়।

ধান ও পাট ছাড়া বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু, তিল, তিসি, তামাক, সরিষা ও নানাবিধ ডাইল, কার্পাস ও চা জন্মে। নিত্য ব্যবহার্য্য শাক সব্জীর মধ্যে আলু, পালং, পটল, বেগুন, মূলা, ঢেঁড়স, টমাটো, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, কপি, থোড়-মোচা প্রভৃতি প্রধান।

শিল্পজাত দ্রব্য—কুটীর শিল্পের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাংলার খ্যাতি আছে। বয়ন-শিল্প এক সময়ে এ দেশে উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ঢাকার মস্‌লিন সুদূর রোমসাম্রাজ্যে পর্য্যন্ত সমাদৃত হইত। বর্ত্তমানেও ঢাকা, চন্দননগর, শান্তিপুর ও টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থান সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও বীরভূম রেশমী বস্ত্রের জন্য এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালি মোটা তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। শাঁখার ও সোনারূপার সূক্ষ্ম কাজের জন্য ঢাকা ও মৃৎ শিল্পের জন্য কৃষ্ণনগরের খ্যাতি আজিও অক্ষুণ্ণ আছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও ময়মনসিংহের পিতল ও কাঁসার বাসন বিখ্যাত। আজকাল বাংলাদেশে বহু কাপড়ের কল, দেশলাইএর কল, চিনির কল, কাগজের কল, চীনামাটি, এলুমিনিয়াম ও কাঁচের কারখানা এবং সাবান ও গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অধিবাসী—বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে বাঙালী বলে। বিগত শতকে অনেক অ-বাঙালী ব্যবসায় বা কার্য্যব্যপদেশে বাংলায় আসিয়া বসবাস করিয়াছেন এবং ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আচারে, ব্যবহারে ও সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণভাবে বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। বাংলার অধিবাসিগণ ধর্ম্মভেদে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। কলিকাতা শহরে এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় অল্প সংখ্যক জৈন, চট্টগ্রাম জেলায় লক্ষাধিক বৌদ্ধ ও বাংলার নানা স্থানে কিছু কিছু দেশীয় খৃষ্টানের বাস আছে। বাংলায় কয়েকটি আদিম জাতিরও বসবাস আছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম ও উত্তর বঙ্গের বরিন্দ এলাকায় নানা স্থানে সাঁওতাল জাতি বাস করেন, ইঁহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। দার্জ্জিলিং জেলায় নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা নামক পার্ব্বত্য জাতির বাস আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পাহাড়ে নাগা, কুকি, টিপরা ও চাকমা প্রভৃতি আদিম জাতির বাস। ইঁহারা কৃষিকার্য্য ও শিকার প্রভৃতির দ্বারা জীবিকার সংস্থান করেন।

ভাষা—বাংলা দেশের ভাষার নাম বঙ্গ ভাষা বা বাংলা। এই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯২জন এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে "ইণ্ডো এরিয়ান" ভাষার "মাগধী" শাখা হইতে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ এই ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক। উত্তরকালে প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী, ফারসি, উর্দ্দু, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা হইতে বহু শব্দাবলী এই ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া ইহার শব্দ-সম্পদকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সহস্রাধিক বর্ষের পুরাতন পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে অপর কোন ভাষার সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ন্যায় উন্নত ও ঋদ্ধিমান নহে। এই ভাষা প্রায় পাঁচ ক্রোর লোকের মাতৃভাষা। ভারতের আর কোন প্রাদেশিক ভাষাকে এত অধিক সংখ্যক লোকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে না।

সংস্কৃতি—বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য্য সভ্যতামূলক হইলেও উহার এমন কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতখণ্ডের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। উত্তরাধিকার আইন, দেবপূজার পদ্ধতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মচিন্তার ধারা, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত—প্রত্যেক বিষয়েই বাঙালীর একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। বাংলার মন্দির, মসজিদ্ ও প্রাসাদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ প্রণালীতে, দেবমূর্ত্তির পরিকল্পনা ও গঠনে, প্রস্তর বা ইষ্টকের উপর ক্ষোদিত চিত্রে, চিত্রপটে, দারুশিল্পে, পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে, লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদিতে, বয়নশিল্পে, লোক সাহিত্যের উপাখ্যানভাগে, সঙ্গীতাদিতে নব নব রাগ রাগিনীর সন্নিবেশে, ধর্ম্ম সাধনায় নব নব ভাবের প্রবর্ত্তনে—সর্ব্বত্রই বাঙালীর সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। যাঁহারা বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন অথবা এই সকল বিষয় অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে এই সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর নহে।

বাংলায় ভ্রমণের প্রয়োজন—পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সারা বাংলার প্রসিদ্ধ স্থানগুলির বিবরণ, কিংবদন্তী, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হইল। বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই নিজস্ব রূপটিকে বুঝিতে হইলে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা আবশ্যক। কানে শোনা ও চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য যে কত সে শুধু চোখে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বাঙালী মাত্রেরই উচিত সুযোগমত বাংলাদেশের এক একটি অংশ দেখিয়া আসা। এক একটি করিয়া দেখিলে ছোট ছোট কয়েকটি অবকাশ-গুলির সুযোগেই বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ ও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা যায়। ইহার জন্য দীর্ঘ অবকাশের প্রয়োজন হইবে না। বাঙালীর পক্ষে ইহা ব্যয়সাপেক্ষও নহে। দূরত্বের স্বল্পতাহেতু ও নানারূপ সুলভ মূল্যের টিকিটের সুবিধা থাকায় অল্প ব্যয়েই বাংলার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসা যায়।

ইহা সত্যই দুঃখের বিষয় যে এমন সোনার বাংলার অধিবাসী হইয়াও অনেকে বাংলাকে চেনেন না ও জানেন না, দেখিবার সুযোগ থাকিতেও দেখেন না। এদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আধার। দেশভক্ত বাঙালী কবির গানে ও কবিতায়, নানা গল্পে ও উপাখ্যানে বাংলার রূপ ও সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মাত্রেই তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন, আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু অনেকেরই বাংলার সহিত পরিচয় শুধু পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া। নিজ জন্মপল্লী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারি খানি গ্রাম এবং কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত দুই একটি বড় শহরের মধ্য দিয়াই বাংলার সহিত অধিকাংশ বাঙালীর পরিচয়। বাংলার অধিবাসিগণের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা হয়ত দিল্লী, লাহোর, হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান বার বার দেখিয়াছেন, কিন্তু বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় কোথায় অবস্থিত তাহার সংবাদই রাখেন না। দূর দূরান্তর ভ্রমণ করা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু এই সকল ভ্রমণ হইতে সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরও প্রয়োজন। এই পরিচয় থাকিলে তবেই অভিজ্ঞতা তুলনামূলক ও পূর্ণ হইবে এবং সত্যকার কাজে লাগিবে। অনেকের ধারণা যে বাংলাদেশে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই; ইহারা যদি একবার গৌড়-পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ষাটগুম্বজ, বিষ্ণুপুর, তমলুক, নবদ্বীপ, গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন, চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম, আদিনাথ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেখিয়া আসেন তবে তাঁহাদের ভুল ধারণা নিশ্চয়ই দূর হইবে।

বাংলায় ভ্রমণ করা সকলের পক্ষে আবশ্যক হইলেও, সব চেয়ে প্রয়োজন স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের পক্ষে। কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। চাক্ষুষ পরিচয়ে আনন্দও হয় যেরূপ, শিক্ষালাভও ঘটে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। য়ুরোপ প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে ছাত্রগণকে লইয়া ভ্রমণ অভিযানে বাহির হওয়া শিক্ষাপদ্ধতির একটি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ। শারীরিক ও মানসিক পরিপুষ্টি সাধনে ইহা যে বিশেষ ফলপ্রদ তাহা বিস্তারিত ভাবে বলার অপেক্ষা রাখেনা। য়ুরোপের ছাত্রদল এক একটি রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত স্থানগুলি পদব্রজে বা স্থান বিশেষে

অপর যান-বাহনের সাহায্যে দেখিয়া আসে। এই সকল ভ্রমণ অভিযানে বাহির হইয়া ইহারা সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জন করে। ইহার দ্বারা তাহাদের চরিত্রগঠন ও শারীরিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে। বর্ত্তমানে এদেশেও ছাত্রগণের মধ্যে ভ্রমণ স্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছাত্রগণের ভ্রমণ অভিযানের সংবাদ মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশ-দর্শনার্থী ছাত্রদলের মধ্যেও বাংলায় ভ্রমণ সম্বন্ধে তাদৃশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। এখানেও মূলে সেই ধারণা, যে বাংলা দেশে দেখিবার মত তেমন কিই বা আছে! ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাধারণ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের ছাত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় বাংলা দেশে আছে অসংখ্য! দেখিবার আগ্রহ লইয়া একবার বাহির হইয়া পড়িলেই এই বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।



বাংলার রাজধানী কলিকাতা।

অবস্থান ও আয়তন—

বাংলার রাজধানী কলিকাতা বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। ইহা গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীরে ২৪ পরগণা জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এই মহানগরীকে ২৪ পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য করা হয়। ভাগীরথী নদীর সাগর সঙ্গম হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় এক শত মাইল।

মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন কলিকাতা শহর বর্ত্তমানে খাস্ কলিকাতা, কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, ইটালী, বালীগঞ্জ, আলিপুর, খিদিরপুর, ভবানীপুর ও কালীঘাট লইয়া গঠিত। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৩০ বর্গ মাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শহরতলী ধরিয়া "বৃহত্তর কলিকাতা" হুগলী জেলার ত্রিবেণী হইতে ২৪ পরগণা জেলার বজবজ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীর লইয়া বিস্তৃত। এই অঞ্চলের জনবহুল শহরতলী, কল-কারখানা, বাঁধা ঘাট, বাগানবাটী, দেবালয়, জেটি ও ডক্ প্রভৃতি কলিকাতা মহানগরীরই অংশ বিশেষ। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৫ মাইল ও বিস্তারে গঙ্গার উভয়কূলে এক মাইল হইতে দুই মাইলের মধ্যে।

প্রাচীন কলিকাতা—

কলিকাতা মহানগরীর প্রাচীন গৌরব বিশেষ কিছুই নাই। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। ইহার বহু স্থান তখন অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বাংলায় তথা ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

কলিকাতা নামের সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গল" কাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত "আইন-ই-আক্‌বরী" গ্রন্থে রাজা টোডরমলের রাজস্ব তালিকায় মহাল কলিকাতার নাম পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে চিৎপুর, কলিকাতা ও কালীঘাটের উল্লেখ আছে।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি—

কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট হইতে "কলিকাতা" নাম হইয়াছে। কবিরামের গ্রন্থে "কিলকিলা" নামক গ্রামের উল্লেখ আছে। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেবের মতে উহা হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে পূর্ব্বে এই স্থান কলিচুণ

বিক্রয়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় কলিকাতা। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে জনৈক ওলন্দাজ পর্য্যটক এই স্থানে বহু মড়ার মাথার খুলি দেখিতে পাইয়া ইহাকে নরককুণ্ডের স্থান বা "গলগথা" নামে উল্লেখ করায় ইহার নাম কলিকাতা হইয়াছে, এইরূপ অনুমানও কেহ কেহ করেন। জন সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি গল্পও প্রচলিত আছে যে, একজন ইংরেজ জনৈক ঘেসেড়াকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি মনে করে, "ঘাস কবে কাটা হইয়াছে" সাহেব বুঝি এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে, এবং উত্তর দেয় "কাল কাটা" এবং এই "কাল কাটা" হইতেই "ক্যালকাটা" বা কলিকাতা নাম হইয়াছে। অপরপক্ষে খালকাটা হইতে ক্যালকাটা ও কলিকাতা নাম হইয়াছে বলিয়াও প্রবাদ আছে।



কালীঘাটের মন্দির

গোবিন্দপুর ও সুতানুটী—

এখন খাস্ কলিকাতা বলিতে যে স্থানকে বুঝায় পূর্ব্বে উহা সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি বিভিন্ন গ্রাম ছিল। বাগবাজারের খাল হইতে নিমতলা পর্য্যন্ত স্থান সুতানুটী, নিমতলা হইতে চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চাঁদপাল ঘাট হইতে আদিগঙ্গা পর্য্যন্ত স্থান গোবিন্দপুর নামে পরিচিত ছিল। কলিকাতায় ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে সুতানুটীতে সুতা বিক্রয়ের একটি বড় হাট ছিল এবং আর্মেনীয় ও পর্ত্তুগীজগণ

তথায় বাণিজ্য করিতেন। গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকেরা এই হাট বসাইয়াছিলেন। শেঠ ও বসাকগণের পূর্ব্ব নিবাস ছিল হুগলীতে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রিক বিপ্লবের জন্য তাঁহারা হুগলী ত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বসবাস করেন। শেঠদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর রাখা হয়, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। সুতা বিক্রয়ের হাটই সুতানুটী নামে পরিচিত হয়।

জব চার্ণকের আগমন—

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম মাদ্রাজ প্রদেশে পদার্পণ করেন ও সেইখানেই বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার শাসন-কর্ত্তা শাহ সুজার নিকট হইতে তাঁহারা বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিয়া হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই হুগলীতে পর্ত্তুগীজগণের ও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণের বাণিজ্য-কুঠি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলীর ফৌজদারের সহিত বিবাদ হওয়ায় ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন এজেন্ট্ জব চার্ণক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহর লুণ্ঠন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবী ফৌজ প্রেরিত হইলে চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সুতানুটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর নবাবের সহিত আপোষ হওয়ায় ইংরেজ বণিকগণ পুনরায় হুগলীতে ফিরিয়া যান। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জব চার্ণক পুনরায় সুতানুটীতে আসিয়া অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই সুতানুটীতে পাকাপাকিভাবে বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। তিনি দেখিতে পান যে হুগলী অপেক্ষা সুতানুটীতে কুঠি নির্ম্মাণের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ তখনকার দিনে আদিগঙ্গার উত্তরে বড় বড় মাল বোঝাই জাহাজ যাইতে পারিত না। খিদিরপুর হইতে ছোট জাহাজ বা নৌকায় করিয়া হুগলী পর্য্যন্ত মাল আনা-নেওয়া করিতে হইত। সুতানুটীতে কুঠি স্থাপন করিলে এই অসুবিধাটি আর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ সুতানুটী গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত হওয়ায় এবং ইহার পূর্ব্বদিকে ধাপার প্রকাণ্ড বিল থাকায় এই স্থানে মাহারাট্টা দস্যু ও মুঘলদিগের উৎপাতের তত সম্ভাবনা ছিল না। তৃতীয়তঃ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এই স্থান হইতে জাহাজযোগে সহজে সমুদ্রাভিমুখে যাওয়ার সুবিধা ছিল। এই সকল কারণে সুতানুটীর উপর জব চার্ণকের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

হুগলীতে ফিরিয়া গেলেও মুঘল কর্ম্মচারীদিগের সহিত ইংরেজ বণিকগণের বিশেষ বনি-বনা হইতে ছিল না। সুতরাং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ অগষ্ট তারিখে জব চার্ণক সঙ্গিগণসহ চারিখানি বাণিজ্য-জাহাজযোগে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সুতানুটীতে আগমন করেন। মহানগরী কলিকাতার প্রথম পত্তন প্রকৃতপক্ষে এই দিন হইতেই আরম্ভ হয়। সুতানুটীতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের পর জব চার্ণক স্বয়ং সেই কুঠির ও কুঠির এলাকাভুক্ত উপনিবেশের অধ্যক্ষ হন। কোম্পানির এলাকায় যাহাতে বহু লোক আসিয়া বসবাস করে সেই জন্য জব চার্ণক অধিবাসিগণকে নানাপ্রকার সুবিধা প্রদান করেন।

চার্ণক সাহেব একটি যুবতী ও সুন্দরী হিন্দু বিধবাকে সতীদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই মহিলাটির মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ সেণ্ট জন্ গির্জ্জার

প্রাঙ্গনে (বর্ত্তমান চার্চ্চ লেনের পার্শ্বে) সমাহিত করা হয়। পত্নীর মৃত্যুতিথি উপলক্ষে চার্ণক সাহেব প্রতিবৎসর তাঁহার সমাধির উপর একটি করিয়া মোরগ বলি দিতেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে জব চার্ণকের মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নীর সমাধির পার্শ্বে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। চার্ণকদম্পতীর সমাধির উপর একটি স্মৃতি-সৌধ আছে। কলিকাতার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্মৃতি-সৌধ।



চার্ণক-স্মৃতি সৌধ

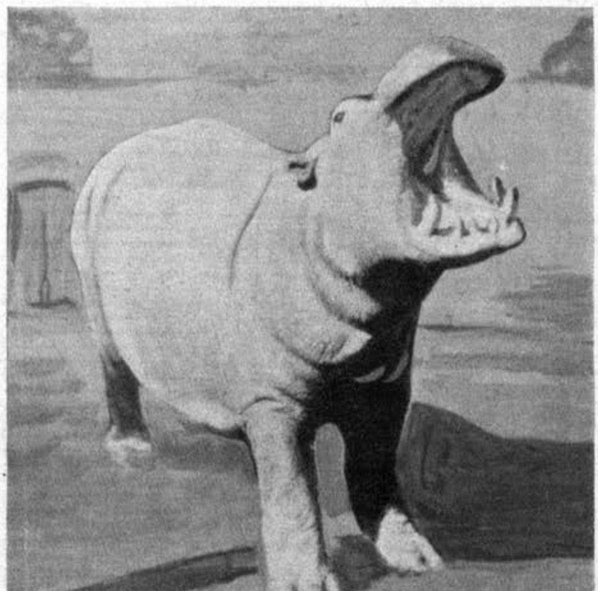
কলিকাতার প্রসার—

সুতানুটীতে কুঠি স্থাপনের পর ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস্-শানের নিকট হইতে ১৬,০০০৲ টাকার বিনিময়ে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করিবার অধিকার লাভ করেন এবং উক্ত খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তারিখে মাত্র ১৩০০৲ টাকা মূল্যে তৎকালীন মালিকগণের নিকট হইতে এই গ্রামত্রয় ক্রয় করেন। এই তিনখানি গ্রামের জন্য কোম্পানিকে মুঘল সরকারে বার্ষিক ১২৮১॥০ খাজনা দিতে হইত।

সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের অধিকার লাভ করার পর হইতে কোম্পানি দপ্তরের কাগজপত্রে কেবলমাত্র কলিকাতার নাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের নাম ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমানেও কলিকাতার বাংলা দলিল প্রভৃতিতে পরগণা সুতানুটী এই নামটি কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কলিকাতা নামের প্রাধান্য সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে পর্ত্তুগীজগণ "কালীকটের" দ্রব্যাদি য়ুরোপে বহু মূল্যে বিক্রয় করিত বলিয়া ইংরেজ কোম্পানিও কালীকট নামের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত "ক্যালকাটা" বা কলিকাতার নাম নিজেদের সেরেস্তায় পত্তন করেন।

ফোর্ট বা দুর্গ—

কলিকাতায় অবস্থানের পর হইতেই ইংরেজ কোম্পানি নিজেদের এলাকায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু নবাবের অনুমতি না পাওয়ায় বহুদিন যাবত এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। অতঃপর চেতোয়া-বরদার রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে বাণিজ্য-কুঠি সুরক্ষিত করিবার



জলহস্তী, আলিপুর চিড়িয়াখানা।

অনুমতি লাভ করেন এবং ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর তীরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে বর্ত্তমান জেনারেল পোস্ট অফিস ও ঈস্‌ট্ ইণ্ডিয়ান রেলের প্রধান কার্য্যালয় যে স্থানে অবস্থিত এই দুর্গটি সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া এই দুর্গটি অধিকার করেন ও ইহার

কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ জয় করিয়া ইংরেজ যখন কার্য্যতঃ বাংলার আধিপত্য লাভ করিলেন তখন ক্লাইভ একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হইল। নূতন বা বর্ত্তমান দুর্গটির নির্ম্মাণকার্য্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয় এবং ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামানুসারে উহার নাম রাখা হয় "ফোর্ট উইলিয়ম।"

কলিকাতায় রাজধানী—

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা বাংলাদেশে ইংরেজ অধিকারের রাজধানী ছিল। অতঃপর বিলাতের পার্লামেন্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাংলার ইংরেজ শাসনকর্ত্তা "গভর্ণর জেনারেল" আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং তৎসঙ্গে মাদ্রাজ ও বোম্বাই ভিন্ন কোম্পানির অধিকারভুক্ত ভারতের অন্যান্য স্থানের শাসনভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল বা বড় লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামক সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুরাতন রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে সরকারী খাজনাখানা কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হয়। এই সময় হইতে কলিকাতা বাংলার সর্ব্বপ্রধান নগর ও ভারতের রাজধানী হইবার গৌরব লাভ করে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলেও বাংলার রাজধানী কলিকাতা আজিও সর্ব্ববিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর।

লোকসংখ্যা—

জব চার্ণক যখন কলিকাতায় কুঠিস্থাপন করেন তখন ইহার লোকসখ্যা ছিল মাত্র ১২,০০০। কিন্তু ইহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ৮,৪৭,৭৯৬; ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯,০৭,৮৫১ এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১১,৯৬,৭৩৪। কলিকাতার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা বোম্বাই শহরের লোকসংখ্যা অপেক্ষা ৩৫ হাজার বেশী। ইহা শুধু কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত স্থানের লোকসংখ্যা। বেহালা, টালীগঞ্জ ও হাওড়া এই তিনটি স্থানকে কলিকাতার অন্তর্ভুক্তরূপে গণনা করিলে কলিকাতার মোট লোকসংখ্যা হইবে প্রায় **সতেরো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার।**

কলিকাতার নাগরিক প্রতিষ্ঠান—

কলিকাতাবাসীর নাগরিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধার ভার কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে ন্যস্ত আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৭ জন কমিশনার লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান কলিকাতা কর্পোরেশন একজন মেয়র, একজন ডেপুটি মেয়র, ৩ জন অল্ডারম্যান ও ৭৫ জন কাউন্সিলর লইয়া গঠিত। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন কলিকাতা শহরে পাকা বাড়ীর সংখ্যা সত্তর হাজারেরও উপর। কর্পোরেশনকে ইহার বত্রিশটি বিভাগ বা ওয়ার্ডে যে রাস্তাগুলির তত্ত্বাবধান করিতে হয় উহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় চারশত মাইল। কলিকাতার অধিবাসিগণের ব্যবহারের জন্য

কর্পোরেশনকে প্রত্যহ অন্যূন ৬৬,৫৩৩,০০০ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করিতে হয়। টালায় লৌহস্তম্ভের উপর পানীয় জলের যে ট্যাঙ্ক আছে, উহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জলাধার। কলিকাতা শহরে কর্পোরেশনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রায় ২৩০টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় প্রায় দুই কোটি টাকা।

কলিকাতার শিক্ষায়তন—

কলিকাতার মত উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ভারতবর্ষে আর নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্থাপত্য শিক্ষা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, অর্থকরী শিক্ষা প্রভৃতি সকল প্রকার শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় আছে। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।



সিনেট হাউস

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উচ্চ শিক্ষামূলক সর্ব্বপ্রকার গবেষণার ব্যবস্থা আছে। এক সময়ে ইহার পরিধি সমগ্র উত্তরভারত, মধ্যভারত ও ব্রহ্মদেশব্যাপী ছিল। বর্ত্তমানে ইহার ক্ষেত্র বাংলা ও আসামের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও ইহা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনরূপে সম্মানিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলি কলিকাতা শহরের তিনটি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। কলেজ স্কোয়ারে সিনেট হাউস, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং ও আশুতোষ বিল্ডিং; পার্শীবাগানে সার্কুলার রোডের উপর বিজ্ঞান কলেজের ভবন এবং বালীগঞ্জে বিজ্ঞানকলেজ সংশ্লিষ্ট লেবরেটরী ও মিউজিয়ম অবস্থিত। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও স্যর তারকনাথ পালিত মহাশয়দ্বয়ের বিপুলদানে বিজ্ঞানকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মর্ম্মরমূর্ত্তি পার্শীবাগান বিজ্ঞানকলেজের বারান্দায় রক্ষিত আছে।

সাধারণ শিক্ষার জন্য কলিকাতার ১৬টি কলেজ, অনূন ১২২টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও পাঁচশতের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুল, কমার্শিয়াল কলেজ, ভেটারিনারী কলেজ, আর্ট স্কুল, সঙ্গীত বিদ্যালয়, শিল্প শিক্ষালয়, মূকবধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার এবং নানারূপ সভা-সমিতি আছে।

কলিকাতার বন্দর—

বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর। বাংলা-নাগপুর, পূর্ব্বভারত ও পূর্ব্ববঙ্গ,—এই তিনটি প্রধান রেলপথ কলিকাতার সহিত বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ভাগীরথী নদী দিয়া বৎসরের সকল সময় ধরিয়াই মাল বোঝাই জাহাজ কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত করিতে পারে। কলিকাতার বন্দরে পৃথিবীর প্রায় সকলদেশ হইতে মালের আমদানি ও রপ্তানি হয়। এই বন্দর কোন্নগর হইতে বজবজ পর্য্যন্ত ২১ মাইল স্থান লইয়া অবস্থিত এবং এই স্থান পোর্টট্রাস্ট্ রেলওয়ে নামক বড় মাপের রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। চিৎপুর হইতে তক্তাঘাট পর্য্যন্ত ৬ মাইল ব্যাপী স্থানে গঙ্গার তীরে কলিকাতার জেটিগুলি ও বড় বড় মালগুদাম অবস্থিত। ইহার মধ্যে তক্তাঘাট, প্রিন্সেপঘাট, আউট্রামঘাট ও চাঁদপালঘাটের জেটিতে জাহাজের যাত্রিগণ উঠা-নামা করেন, বাকীগুলিতে মাল বোঝাই ও মাল খালাস হয়। খিদিরপুর ডকে ২৭টি এবং কিংজর্জ ডকে ৫টি বার্থ জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাসের জন্য আছে। তাহা ছাড়া গার্ডেনরীচে মালের জন্য ৫টি নূতন জেটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বোম্বাই শহর সমুদ্রতীরে অবস্থিত হইলেও বন্দর হিসাবে কলিকাতা বোম্বাই অপেক্ষা অনেক বড়। বোম্বাই-এ সমস্ত বৎসর ধরিয়া যত মালের আমদানি-রপ্তানি হয়, কলিকাতা হইতে তাহার প্রায় দ্বিগুণ পাট ও কয়লা চালান যায়। কলিকাতা বন্দরের পরিচালনার ভার পোর্টট্রাস্ট্ নামক একটি সঙ্ঘের হস্তে ন্যস্ত আছে।

কলিকাতার আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া—

কলিকাতায় চৌদ্দ লক্ষের উপর লোকের বাস. ইহার মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। ইহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার ও রুচি অনুযায়ী কলিকাতায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা আছে। থিয়েটার, সিনেমা, নাচ, গান, জলসা, রেডিও প্রভৃতি কলিকাতার দৈনন্দিন ব্যাপার। কলিকাতার ময়দানে ও অনেকগুলি পার্কে ঋতু বিশেষে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, হকি, ও কপাটি প্রভৃতি খেলা হয়। মুষ্টি যুদ্ধ, অসি ক্রীড়া, ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন, সাঁতার প্রতিযোগিতা, কুস্তি, যাদুবিদ্যা ও লাঠি খেলা প্রভৃতির আয়োজনও মধ্যে মধ্যে হয়।

কলিকাতার দ্রষ্টব্য—

বৈদেশিক পর্য্যটকগণ কলিকাতাকে "সিটি অব্ প্যালেসেস্" বা সৌধ-নগরী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক কলিকাতার ন্যায় এরূপ সুদৃশ্য অট্টালিকাবলী পূর্ণ

প্রশস্ত রাজপথ ও সুসজ্জিত বিপণি শোভিত নগরী কেবল মাত্র ভারতবর্ষে বলিয়া নহে সমগ্র এসিয়া মহাদেশে এক মাত্র জাপানের রাজধানী টোকিও ভিন্ন আর একটিও নাই। আলোকমালায় সজ্জিত রাত্রিকালের কলিকাতার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। চোখে না দেখিলে কেবল মাত্র বর্ণনা পাঠের দ্বারা তাহা উপলব্ধি করা যায় না। কলিকাতার সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "জগতের সেরা দ্বাদশ নগরী, গণনা ইহার তাদেরই সাথে।" কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ নগরীর মধ্যে অন্যতম এবং সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র লণ্ডন শহরের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মহানগরী। এই মহানগরীতে দেখিবার বস্তু এত বেশী আছে যে কেবল মাত্র তাহাদের নামোল্লেখ করিতে গেলে কয়েক পৃষ্ঠা লাগিবে। যাঁহারা বাহির হইতে কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে আসেন তাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতার যে সকল স্থান দেখিয়া থাকেন, অথবা যে সকল স্থান না দেখিলে কলিকাতা দেখা অসম্পুর্ণ থাকিয়া যায়, নিম্নে কেবল মাত্র সেইরূপ কয়েকটি দ্রষ্টব্য বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) **পরেশনাথের মন্দির**—বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট্ নামক রাস্তার উপর অবস্থিত। চলিত কথায় লোকে ইহাকে পরেশনাথের বাগান বলে। একটি মনোরম উদ্যান মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত। বিবিধ বর্ণের প্রস্তর ও কাচের দ্বারা সুসজ্জিত এই



পরেশনাথের মন্দির

মন্দিরটির সৌন্দর্য্য অতি অপূর্ব্ব। মন্দিরের মধ্যে জৈন তীর্থঙ্কর শীতলানাথজীর মূর্ত্তি আছে। উদ্যান মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বহু বসিবার স্থান আছে। একটি সুন্দর

ফোয়ারার মধ্যে লাল, নীল, হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। প্রত্যহ বিকাল বেলায় বহু লোক এই স্থানে বেড়াইতে যান। জ্যোৎস্না রাত্রিতে এই স্থানটি অতি সুন্দর দেখায়। কলিকাতায় নবাগন্তুকের পক্ষে এই স্থানটি অবশ্য দ্রষ্টব্য।

(২) **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও রমেশ ভবন**—হালসী বাগানে অপার সার্কুলার রোডের উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ উমিচাঁদের বাগান ছিল। ইহা বাঙালীর সাহিত্য সাধনার সর্ব্ব প্রধান কেন্দ্র। ১৩০১ সালে শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে মাত্র ৩০ জন সভ্য লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূত্রপাত হয়। ১৩১৫ সালে স্বর্গীয় দানবীর মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয়ের প্রদত্ত জমির উপর বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মিত হয়। সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে



রমেশ ভবন

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রায় যাবতীয় পুস্তকই আছে। বাংলা দেশের আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বাংলা গ্রন্থ নাই। বর্ত্তমানে ইহার পুস্তক সংখ্যা ৫০ হাজারেরও উপর এবং পুঁথির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। সাহিত্য পরিষৎ বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিতেছেন। বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু স্থানে সাহিত্য পরিষদের বহু শাখা পরিষৎ আছে।

সম্প্রতি পরিষদ্ ভবনের সংলগ্ন "রমেশ ভবন" নামক অপর একটি সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি পরলোকগত মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে ইহা নির্ম্মিত। এই ভবনে বহু পুরাতন প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তি, শিলালেখ, ইষ্টক ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাদি রক্ষিত আছে। এখানকার তিনটি সুন্দর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি বাংলার শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রসিদ্ধ কলারসিক উইলিয়ম রদেনষ্টীনের মতে এই মূর্ত্তিগুলি অতুলনীয়। এ সকল ছাড়া এখানে রাজা রামমোহন রায়ের কেশগুচ্ছ ও পাগড়ি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিবার টেবিল, বঙ্কিমচন্দ্রের দোয়াত, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি, কবিতার পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত চশমা, ঝরণা কলম ইত্যাদি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্দ্র পালের চশমা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জামা, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায় ও গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর দোয়াতদানী প্রভৃতি সংগৃহীত আছে।

(৩) **বসু বিজ্ঞান মন্দির**—৯৩, অপার সার্কুলার রোডের উপর অবস্থিত। ইহা জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত আচার্য্য স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা মন্দির। এই বিজ্ঞান মন্দিরে বসিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ জীবনের অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সমগ্র সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। এই



বসু বিজ্ঞান মন্দির

ভবনটি প্রাচ্য স্থাপত্য প্রথায় নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে দেড় হাজার লোকের বসিবার উপযোগী একটি কক্ষ আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই কক্ষে তাঁহার নব নব আবিষ্কারের সম্বন্ধে যন্ত্রাদি সহযোগে বক্তৃতা দিতেন। এই কক্ষের ভিতরকার প্রাচীর ও ছাদে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। বিজ্ঞান মন্দিরের পার্শ্বেই আচার্য্য বসুর বাস ভবন এবং নিকটেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, মূক-বধির বিদ্যালয় ও রামমোহন লাইব্রেরী অবস্থিত।

(৪) **কলেজ স্কোয়ার**—ইহার চলিত নাম গোলদীঘি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্যালয় সিনেট হাউস, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং ও আশুতোষ বিল্ডিং ইহার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সিনেট হাউসের গোলাকার স্তম্ভগুলি দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার বারান্দায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। সিনেট হাউসের প্রধান কক্ষের আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৬০ ফুট। এই কক্ষে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির আলেখ্য ও আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এখানে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র একসঙ্গে বসিয়া পরীক্ষা দিতে পারে। সিনেট হাউসের পশ্চিম দিককার কক্ষে "আশুতোষ স্মৃতি চিত্রশালা" নামে একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় চারু শিল্পের বিশেষতঃ বাংলার চারুকলার বিভিন্ন ধারার পরিচায়ক দ্রব্যাদি এখানে সংগৃহীত হইতেছে।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংটি দ্বারবঙ্গের পরলোকগত মহারাজা স্যর রামেশ্বর প্রসাদ সিংহের আংশিক অর্থ সাহায্যে নির্ম্মিত। এই পাঁচতলা বাটীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগার, আইন কলেজ ও আইন কলেজ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও গ্রন্থশালা অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রাচীর গাত্রে কৃতী বাঙালী চিত্রকরগণের দ্বারা অঙ্কিত অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক চিত্রাবলী আছে। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

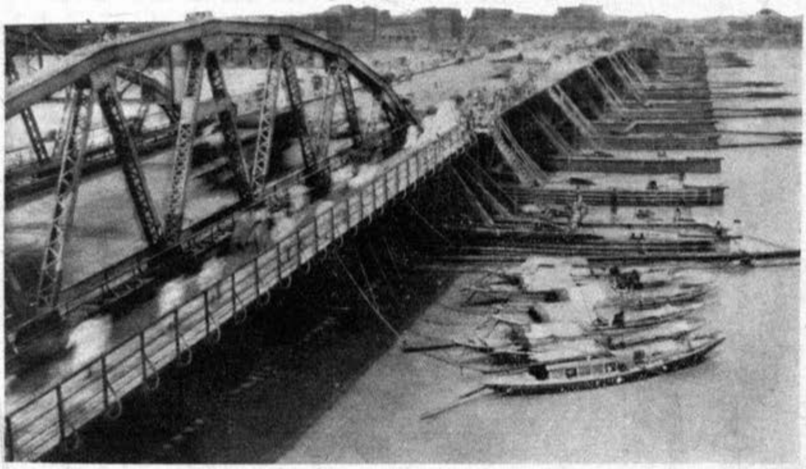
গোলদীঘির পূর্ব্বতীরে বিগত মহাযুদ্ধে নিহত বাঙালী সৈনিকগণের একটি স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। ইহার অতি নিকটে রাস্তার ঠিক অপর পারে "শ্রীধর্ম্মরাজিকা চৈত্য বিহার" নামে একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে একটি হস্তিদন্তের পেটিকায় বুদ্ধদেবের একখণ্ড অস্থি রক্ষিত আছে। "মহাবোধি সোসাইটি" নামক বৌদ্ধ সমিতির কার্য্যালয় এই বিহারে অবস্থিত। এই মন্দিরের হল ঘরের প্রাচীর গাত্রে অজন্তা গুহার আদর্শে অনেক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। গোলদীঘির দক্ষিণতীরে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের সমাধি বিদ্যমান ও পশ্চিমকূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি অবস্থিত।

কলেজ স্কোয়ারের সন্নিকটে মেডিক্যাল কলেজ ও হাঁসপাতাল, ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিন, অল্ ইণ্ডিয়া ইনস্‌টিট্যুট্ অব্ হাইজিন্ এণ্ড পাবলিক হেল্‌থ্, হেয়ার ও হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, ইউনিভারসিটি ইন্‌টিট্যুট্ ও অনতিদূরে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে মনীষী কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তর মূর্ত্তি অবস্থিত।

ট্রপিক্যাল স্কুলের গবেষণাগারে বসিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর রোণাল্ড রস্ আবিষ্কার করেন যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকেরাই ম্যালেরিয়ার বাহন।

হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের সন্নিকটে কলেজ স্ট্রীট্ বাজারে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ম অবস্থিত; এখানে ভারতের কৃষি ও শিল্পজাত বহু দ্রব্যের নমুনা রক্ষিত আছে।

(৫) **রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মর্ম্মর প্রাসাদ**—চোরবাগানে মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটের উপর বিখ্যাত ধনী রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্ব্বেল হাউস বা মর্ম্মর প্রাসাদ নামক সুরম্য অট্টালিকা অবস্থিত। এরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত সৌধ বাংলায় অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। দেশ বিদেশের বহুমূল্য চিত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি ও আসবাব পত্র দ্বারা এই প্রাসাদ সুসজ্জিত। একটি বৃহৎ মনোরম উদ্যান মধ্যে এই ভবনটি অবস্থিত। উদ্যানের মধ্যে একটি কৃত্রিম পাহাড় ও ফোয়ারা আছে, ইহার এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানাও আছে। এই চিড়িয়াখানায় নানা দেশের নানা জাতীয় ও নানা বর্ণের পক্ষী আছে। মল্লিক পরিবারের গৃহদেবতা জগন্নাথদেবের মন্দির এই উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গনে প্রত্যহ ২।৩ শত কাঙালীকে খাইতে দেওয়া হয়।



হাওড়ার পুল

(৬) **হাওড়ার পুল**—হ্যারিসন রোডের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার উপর এই বিখ্যাত ভাসমান সেতু অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ভাসমান নৌকার (পন্টুন) উপর অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এই পুলটি নির্ম্মিত হয়। ইহার উপর দিয়া বাস, লরী, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি চলিবার প্রশস্ত রাস্তা ও দুইদিকে লোক চলাচলের জন্য "ফুট পথ" আছে। মধ্যের দুইখানি নৌকা ইচ্ছামত সরাইয়া লইয়া গিয়া পুল খুলিয়া বড় বড় স্টীমার ও জাহাজ যাতায়াতের পথ করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই পুলের উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড ঝুলান সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। এই সেতুর নির্ম্মাণ শেষ হইলে স্টীমার যাতায়াতের জন্য পুল খুলিবার আবশ্যক হইবে না। এই সেতুটি কেবল মাত্র কলিকাতার বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হইবে।

(৭) **টাকশাল**—হাওড়ার পুলের কিছু উত্তরেই স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর কলিকাতার টাকশাল অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাকশাল বলিয়া কথিত। এখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি আবশ্যক হয়।

(৮) **লালদীঘি বা ডালহৌসী স্কোয়ার**—নামক উদ্যান ও পুষ্করিণীর উত্তরে রাইটার্স বিল্ডিং বা বাংলা সরকারের দপ্তরখানা অবস্থিত। দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে রাস্তার উপর অন্ধকূপ হত্যার একটি স্মারক স্তম্ভ আছে। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাটিকে সর্ব্বৈব কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করেন। লালদীঘির পশ্চিমে জেনারেল পোস্ট্ অফিস বা বড় ডাক ঘরের সুদৃশ্য ভবন, দক্ষিণে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস বা বড় তার ঘর এবং পূর্ব্বদিকে কারেন্সী অফিস অবস্থিত। এই দীঘির নিকটে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হেড্ অফিস, ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ের হেড অফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ক্লাইভ স্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গুলি অবস্থিত। লালদীঘির পশ্চিম তীরে সম্প্রতি বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী পরলোকগত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

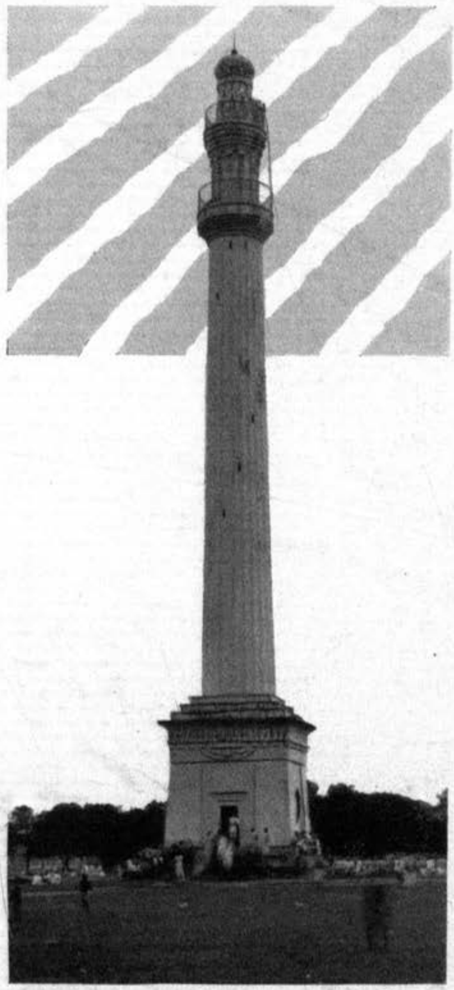


বড় ডাকঘর

(৯) **নাখোদা মস্‌জিদ**—লোয়ার চিৎপুর রোড ও জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত। প্রকাণ্ড গম্বুজ ও সু-উচ্চ মিনার শোভিত এই মসজিদটি কলিকাতার মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ মুসলমান ভজনাগার। এখানে একসঙ্গে বহু শত লোক নমাজ পড়িতে পারে।

(১০) **গড়েরমাঠ বা ময়দান**—ইহাকে কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য বলিলেও চলে। কলিকাতার গড় বা দুর্গ এই মাঠের এক প্রান্তে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এত বড় খোলা মাঠ ভারতের অপর কোন শহরে নাই। কলিকাতার অনেকগুলি দ্রষ্টব্য এই মাঠের মধ্যে ও আশেপাশে অবস্থিত। মুক্ত হাওয়া উপভোগ ও খেলাধুলা দেখিবার জন্য

এখানে প্রত্যহ বিকাল বেলায় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হয়। এই মাঠের মধ্য দিয়া তরুবীথি শোভিত সুন্দর সুন্দর কয়েকটি রাজপথ আছে ও ইহার স্থানে স্থানে খ্যাতনামা সৈনিক ও রাজপুরুষগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।



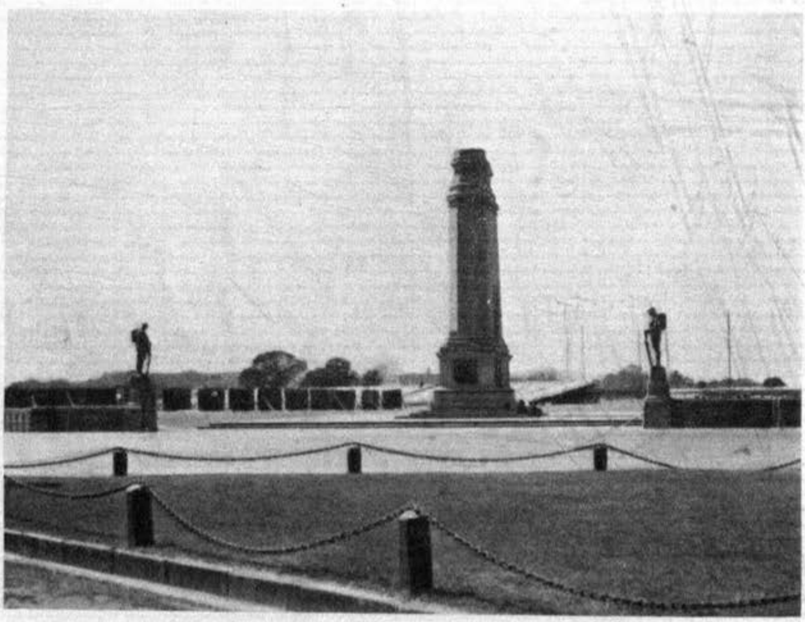
মন্নুমেণ্ট

গড়ের মাঠে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে সু-উচ্চ মন্নুমেণ্ট্। নেপালযুদ্ধজয়ী স্যর ডেভিড্ অক্টারলোনির স্মৃতি রক্ষার্থে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার উচ্চতা ১৫২ ফুট। ইহার মধ্যস্থ ঘুরানো সিঁড়ি দিয়া উপরের রেলিং ঘেরা দুইটি ব্যালকনিতে

পৌঁছানো যায়। ইহার উপর হইতে কলিকাতা মহানগরী ও আশেপাশের দৃশ্য ছবির মত সুন্দর দেখায়। মনুমেণ্টে উঠিতে হইলে লালবাজারের পুলিশ অফিস হইতে ছাড়পত্র লইতে হয়।

কেল্লা—ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীরে "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ অবস্থিত। এই দুর্গটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট ও পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। ইহার চারিদিকে ঢালু মৃত্তিকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টনী দেওয়া আছে। এই দুর্গটিকে একটি ছোট খাট শহর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ভিতর প্রায় দশ হাজার সৈনিকের বাসোপযোগী ব্যারাক, গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম, গির্জা, প্যারেডের মাঠ, দোকানপশার ও বাঁধানো রাস্তা আছে। এই দুর্গে যাতায়াত করিবার ছয়টি ফটক আছে। দুর্গ দেখিতে হইলে ছাড়পত্রের প্রয়োজন। প্রতিদিন বেলা একটার সময় এই দুর্গ হইতে তোপধ্বনি করা হয়।

সেনোটাফ্—মনুমেণ্ট্ ও কেল্লার মধ্যবর্ত্তী রেড্ রোডের মোড়ে বিগত মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকগণের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সেনোটাফ্ বা স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



সেনোটাফ্

ঈডেন উদ্যান—কলিকাতার অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য ঈডেন গার্ডেন ময়দানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের ভগিনী মিসেস্ ঈডেনের উদ্যোগে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার রচনা কৌশল অতি সুন্দর। এই উদ্যানটি সুন্দর সুন্দর তড়াগ, কুঞ্জ, পুষ্পবীথি, সেতু ও প্রশস্ত বর্ত্ম দ্বারা সুশোভিত। ইহার মধ্যে একটি ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা আছে। উহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের পর প্রোম হইতে আনীত হয়। শীতকালে ঈডেন উদ্যানে ক্রিকেট খেলা ও নানাপ্রকার প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

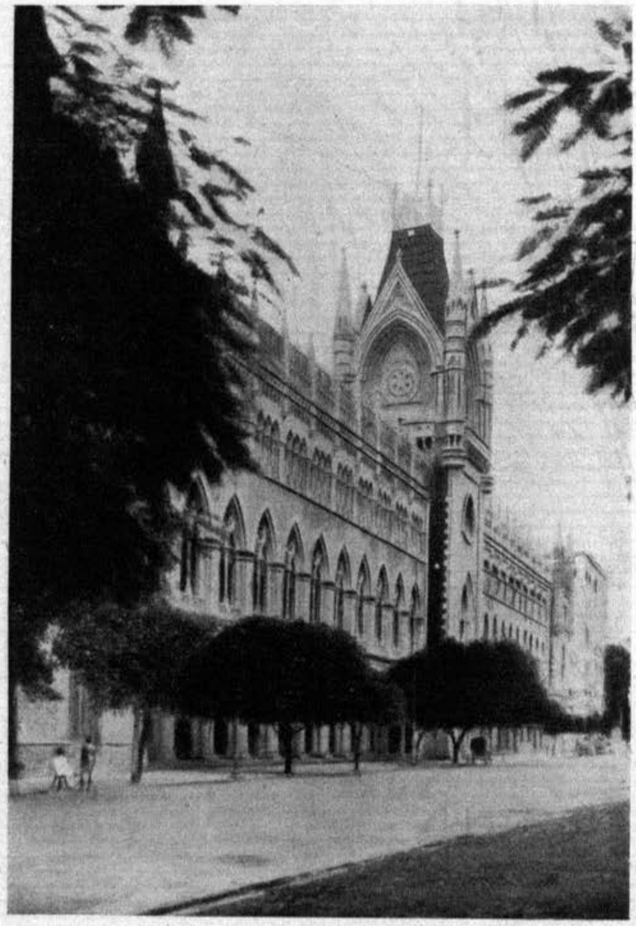
আউট্রাম ঘাট—ঈডেন উদ্যানের পশ্চিম দিকে আউট্রাম ঘাট। এই ঘাটে প্রকাণ্ড জেটির উপর কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি দ্বিতল গৃহ আছে। এই ঘাট হইতে রেঙ্গুণগামী যাত্রী জাহাজ ছাড়ে। গঙ্গার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অনেকে এই জেটির উপর অপরাহ্ণে বেড়াইতে যান। আউট্রাম ঘাটের চৌমাথার উপর পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



প্যাগোডা, ঈডেন গার্ডেন

ঈডেন উদ্যানের উত্তর দিকে হাইকোর্ট, টাউন হল, কাউন্সিল গৃহ ও লাট ভবন অবস্থিত।

হাইকোর্ট—হাইকোর্টের সু-উচ্চ চূড়াগুলি বহুদূর হইতে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সুবৃহৎ বিচারালয়টি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্ম্মাণ প্রণালী বিলাতের ইপ্রেস্‌নগরীর সুপ্রসিদ্ধ টাউনহল হইতে গৃহীত।



হাইকোর্ট

টাউন হল—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাবাসীর অর্থে টাউন হল নির্ম্মিত হয়। এখানে কলিকাতার নাগরিকগণের বড় বড় সভা হয়। ইহার বিস্তৃত সোপানাবলী ও স্তম্ভশ্রেণী দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কাউন্সিল ভবন—টাউন হলের বিপরীত দিকে প্রকাণ্ড গম্বুজবিশিষ্ট কাউন্সিল ভবনে বাংলার আইন সভার অধিবেশন হয়। ইহার উত্তর দিকের প্রাঙ্গনে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকারী লর্ড বেন্টিঙ্কের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি আছে। ইহার শিল্পীর নাম ওয়েস্টম্যাকট্। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে উত্তর ভারতের সতীদাহের একটি সুন্দর চিত্র ব্রোঞ্জে উৎকীর্ণ আছে। সদ্য



লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি

বিধবার চিতায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হওয়া, তাহার কোলে একটি শিশুর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ততা, অপরটির আতঙ্কে একটি আত্মীয়কে জড়াইয়া ধরা, পুঁথিহস্তে পুরোহিতের বিমর্ষ ও চিন্তামগ্ন মুখভাব,—ইহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শিল্পী গভীর সহানুভূতির সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লাটভবন—গবর্ণমেন্ট্ হাউসটি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কর্ত্তৃক প্রায় তের লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলাতের "কেডেলস্টোন" প্রাসাদের আদর্শে নিম্মিত হয়। ইহা এরূপভাবে নিম্মিত যে, যেদিক্ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হউক না কেন ইহার প্রত্যেক কক্ষেই বাতাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই বাড়ীতে বড়লাট বাস করিতেন, ইহা এখন বাংলার শাসনকর্ত্তার বাসভবন। এই বাটীতে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই।

টিপু সুলতানের মস্‌জিদ—ময়দানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ধর্ম্মতলা স্‌ট্রীটের উপর যে সুন্দর মস্‌জিদ্‌টি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা টিপু সুলতানের মস্‌জিদ নামে পরিচিত। টিপু সুলতানের পুত্র নবাবজাদা গোলাম মহম্মদ কর্ত্তৃক ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহা নিম্মিত হয়। টিপু সুলতান মস্‌জিদের নিকটে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।



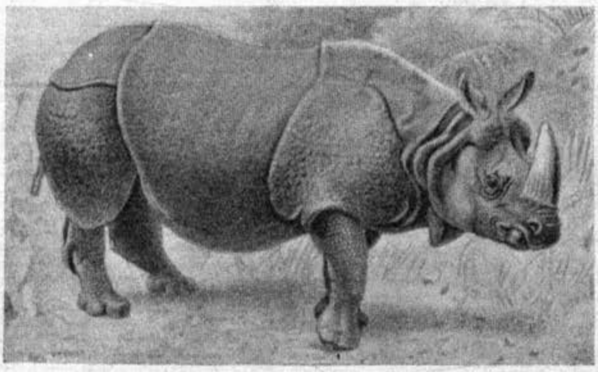
ল্যান্‌স্‌ডাউন মূর্ত্তির পাদপীঠ

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—ময়দানের উত্তরে এস্‌প্লানেড্ ট্রাম স্টেশনের নিকটেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামক বৃহৎ সরকারী গ্রন্থাগার অবস্থিত। এত বড় গ্রন্থাগার ভারতবর্ষে আর নাই, ইহার পুস্তক সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষের উপর। সর্ব্বসাধারণ ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

চৌরঙ্গী—ময়দানের পূর্ব্বদিকে কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিত রাজপথ চৌরঙ্গী রোড অবস্থিত। প্রবাদ, বর্ত্তমান কলিকাতার যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই অঞ্চলের

অরণ্য মধ্যে চৌরঙ্গীনাথ নামক একজন সিদ্ধযোগী বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে এই রাজপথের নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সন্ধ্যার সময় আলোক মালায় ভূষিত হইয়া চৌরঙ্গী অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

যাদুঘর—চৌরঙ্গীর উপরেই সুবিখ্যাত যাদুঘর অবস্থিত। এখানে নানাপ্রকার ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক বস্তু সংগৃহীত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড় ও এরূপ বৈচিত্র্য পূর্ণ মিউজিয়ম আর নাই। বিবিধ খনিজ পদার্থ, কৃষিজাত দ্রব্য, মৃত পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর নমুনা, প্রাচীন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধযুগের শিল্প সাধনার নিদর্শন, সহস্র বৎসরেরও অধিক পুরাতন মিশর দেশীয় মমি বা শবদেহ, ব্রহ্মরাজ থিবোর স্বর্ণসিংহাসন, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা হইতে আবিষ্কৃত পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন দ্রব্য ও অনার্য জাতির ব্যবহৃত বহুবিধ বস্তু প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত এই বৃহৎ ভবনটি দেখিলে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হয়। ঐতিহাসিকযুগের নিদর্শনের মধ্যে সারনাথের অশোকস্তম্ভের চূড়া ও একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর পেটিকা বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য ব্যতীত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের প্রস্তর কৌটার মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি পাওয়া গিয়াছিল।



গণ্ডার—আলিপুর চিড়িয়াখানা

মুদ্রাকক্ষে বহু ভারতীয় মুদ্রা এবং মূল্যবান জহরত ও প্রস্তরাদি রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে সম্রাট সাজাহানের একটি পান্নার পেয়ালা আছে। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনকালে এই পেয়ালাটি লইয়া গিয়াছিলেন।

যাদুঘরে প্রায় পাঁচশত উল্কাপিণ্ড রক্ষিত আছে। উল্কাপিণ্ডের এত অধিক সংগ্রহ এসিয়া মহাদেশে আর কোথাও নাই। এই সংগ্রহটি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

সপ্তাহে শুক্রবার ছাড়া অন্যান্য দিন যাদুঘরে বেলা ১০টা (বৃহস্পতিবারে বেলা ১২টা) হইতে অপরাহ্ণ ৪।৫টা পর্য্যন্ত সকলেই বিনামূল্যে প্রবেশ করিতে পারেন। শুক্রবারে চারি আনা করিয়া দর্শনী লাগে।

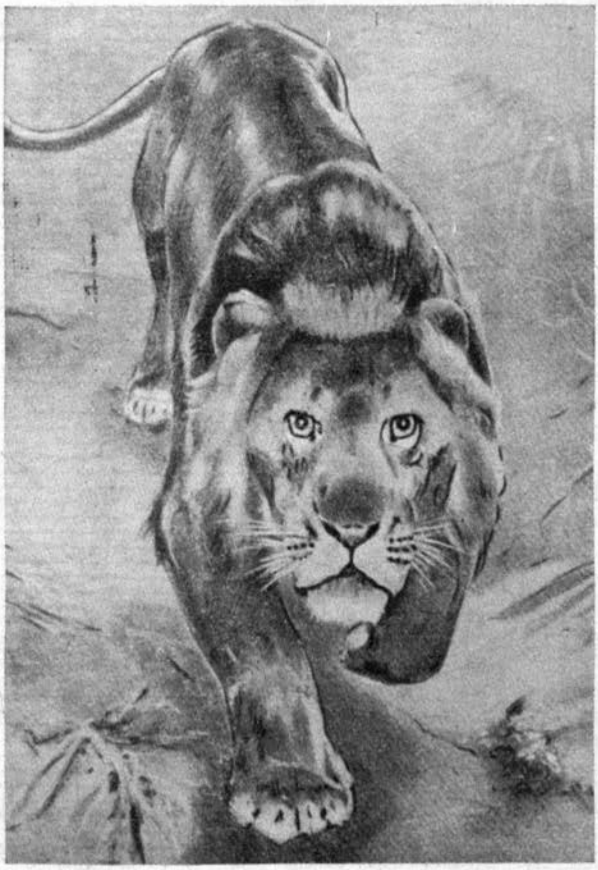
হগ্ সাহেবের বাজার—যাদুঘরের নিকটে লিনড্‌সে সট্রীটের উপর কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুসজ্জিত বাজার হগ্‌মার্কেট অবস্থিত। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ্ কর্ত্তৃক এই বাজারটি স্থাপিত হয়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই বাজারটির খ্যাতি আছে। এখনকার সুপরিচ্ছন্ন ও বিবিধ পণ্যের দ্বারা সুশোভিত দোকানগুলি দেখিলে যেন চোখ জুড়ায়। এখানে পাওয়া যায় না এরূপ দ্রব্য অতি অল্পই আছে। সকালে ও বিকালে এই বাজারে বহু সাহেব মেম ও ভারতীয় ধনী ব্যক্তিগণের সমাগম হয়।



ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—ময়দানের দক্ষিণদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল অবস্থিত। লর্ড কার্জনের পরিকল্পনায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষা কল্পে এই সুন্দর সৌধটি নির্ম্মিত হয়। ইহা আগাগোড়া শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত: তড়াগ ও কুঞ্জপরিশোভিত একটি সুরম্য উদ্যান মধ্যে এই বিশাল সৌধটি অবস্থিত। ইহা আধুনিক জগতের প্রসিদ্ধ এবং প্রধান সৌধগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ভিতরে বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত দেশী ও বিদেশীয় চিত্রাবলী, প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্র, ঐতিহাসিক দলিল পত্র, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্যবহৃত টেবিল, পিয়ানো প্রভৃতি কতিপয় সামগ্রী, তাঁহার অভিষেক কালের একটি অতি সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি ও মুর্শিদাবাদের

নবাব নাজিমের প্রাচীন মসনদ প্রভৃতি বহু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সুরক্ষিত আছে। পশ্চিম দিকের বারান্দায় শিল্পী ওয়েস্টম্যাকৃট্ কৃত ওয়ারেন হেষ্টিংসের অতি সুন্দর একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। ইহার পাদপীঠের দক্ষিণ দিকে পুঁথিহস্তে দণ্ডায়মান এক প্রশান্তমূর্ত্তি চিন্তাশীল ব্রাহ্মণের চিত্র এবং বামদিকে পাঠনিরত একজন মৌলবির চিত্র আছে। এই চিত্রযুগলের দ্বারা শিল্পী ভারতীয় সংস্কৃতির দুইটি বিভিন্ন ধারা গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।



সিংহ, আলিপুর চিড়িয়াখানা

এই স্মৃতি-সৌধের শীর্ষদেশে একটি ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বিজয়-দেবতার মূর্ত্তি আছে। উহা ১৬ ফুট উচ্চ ও তিন টন ভারী। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে হাওয়ার গতির সহিত ইহা বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়া থাকে। প্রধান গম্বুজটি জমি হইতে ১৮২ ফুট উচ্চ। কলিকাতার বহিস্থ বহু স্থান হইতে এই গম্বুজটি দৃষ্টি গোচর হয়। এই গম্বুজে উঠিতে হইলে সৌধ মধ্যস্থিত অফিস হইতে অনুমতি লইতে হয়। বাহির ও ভিতরের গম্বুজের

মধ্যবর্ত্তী অলিন্দ এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে এখানে মৃদুস্বরে কথা বলিলে তাহার প্রতিধ্বনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করে। উদ্যানের মধ্যে মহারাণীর একটি বৃহৎ ব্রোঞ্জমূর্ত্তি ও ঠিক্ বাহিরেই লর্ড কার্জনের একটি ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে।

সোমবার ও শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বেলা ১০টা হইতে ৪।৫ টা পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জনসাধারণরে জন্য বিনা মূল্যে খোলা থাকে। শুক্রবারে আট আনা করিয়া দর্শনী লাগে। ইহার সংলগ্ন যে ছবির গ্যালারী আছে তাহা দেখিতে হইলে চারি আনা করিয়া দর্শনী দিতে হয়।



কাঙ্গারু, আলিপুর চিড়িয়াখানা।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিম দিকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ রেস্‌কোর্স বা ঘোড়দৌড়ের মাঠ অবস্থিত। এরূপ সুন্দর রেস্‌কোর্স প্রাচ্য ভূখণ্ডে কমই আছে।

বড় গির্জ্জা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান গির্জ্জা সেণ্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল অবস্থিত। ইহার উচ্চ চূড়াও বহুদূর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এসিয়াটিক সোসাইটি---ইহাও ময়দানের নিকটে পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ইহা এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষা-পরিষদ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বখ্যাত মনীষী স্যর উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মর্ম্মরমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি আছে। ইহার গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত প্রায় ১৬,০০০ সংস্কৃত ও ৫,০০০ ফারসি পুঁথি এবং বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাদি আছে। এই সমিতির উদ্যোগেই যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক প্রাচীন লোকে এই জন্য যাদুঘরকে এখনও "সোসাইটি" নামে অভিহিত করেন।

(১১) **আলিপুরের চিড়িয়াখানা**—ইহা আদিগঙ্গার তীরে খিদিরপুর ব্রীজের নিকটে অবস্থিত। ইহা একাধারে একটি মনোরম উদ্যান ও পশুশালা। ভারতবর্ষে এতবড় পশুশালা আর নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ভল্লুক, বানর প্রভৃতি আমাদের দেশের জন্তু ব্যতীত আফ্রিকার সিংহ, জলহস্তী (হিপো), জিরাফ, জেব্রা, ওরাংওটাং, কাঙ্গারু ও নানাদেশের দুর্ল্লভ পশুপক্ষী সযত্নে রক্ষিত আছে। অপরাহ্ণে বেলা প্রায় ৩টার সময় সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জানোয়ারকে কাঁচা মাংস খাইতে দেওয়া হয় এবং উহা দেখিবার জন্য ঐ সময়ে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। রবিবার ভিন্ন অন্য দিন বেলা ১০টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চিড়িয়াখানায় জন প্রতি এক আনা করিয়া দর্শনী লাগে।

(১২) **বেলভেডিয়র**—ইহা চিড়িয়াখানার সম্মুখেই অবস্থিত। বড়লাট কলিকাতায় আসিলে এইখানে অবস্থান করেন। ১৮৫৮ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা ছোট লাটের বাসভবন ছিল। কথিত আছে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্ উস্ শান কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা তৎকালীন সুবেদারের মৃগয়া-ভবন ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(১৩) **খিদিরপুরের ডক্**—ইহাও কলিকাতার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। গঙ্গা হইতে খাল দিয়া এই ডকে ইচ্ছামত জল সরবরাহ করা হয়। এখানে সর্ব্বদাই নানা-দেশীয় বড় বড় জাহাজকে মাল বোঝাই ও মাল খালাস করিতে দেখা যায়। এখানে চারটি শুষ্ক বা জলহীন ডক আছে। এই ডকগুলিতে জাহাজ আনিয়া পরে সমস্ত জল বাহির করিয়া দিয়া ইহাকে শুষ্কখাতে পরিণত করা হয় এবং তথায় জাহাজগুলির মেরামত কার্য্য চলে। ডকের মুখে গঙ্গার উপর একটি ঘড়িসংযুক্ত উচ্চ আলোকস্তম্ভ আছে। খিদিরপুরের দক্ষিণ হইতে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত ছোট ছোট জাহাজ মেরামতের অনেকগুলি ডক্ আছে। নিকটেই গার্ডেনরীচে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বড় দপ্তর বা প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত।

(১৪) **কালীঘাট**—হিন্দু দর্শকগণের নিকট কালীঘাট কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য। কালীঘাট একটি মহাপীঠ, এখানে সতীর দক্ষিণ পদের চারিটি অঙ্গুলি পড়িয়াছিল; দেবীর নাম কালিকা, ভৈরব নকুলেশ্বর। দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে নকুলেশ্বরের মন্দির। কালীঘাটের প্রান্ত দিয়া আদিগঙ্গা প্রবাহিতা। কালীঘাটের কালীর মূর্ত্তি পাষাণময়ী।

এই মূর্ত্তির অধোভাগ অদৃশ্য, কটীদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গ বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত ও জিহ্বা স্বর্ণমণ্ডিত। কালীঘাটকে লক্ষ্য করিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"এই কলিকাতা কালিকাক্ষেত্র কাহিনী ইহার সবার শ্রুত।
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত॥"

কালীঘাটের আদি মন্দির যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্দির বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় কর্ত্তৃক ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তৎপরে এই মন্দিরের বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছে। প্রবাদ, বহু প্রাচীনকালে আদিগঙ্গার তীরে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী জেলের দক্ষিণে কালীর অতি প্রাচীন আদি মন্দির ছিল এবং বর্গীরা এখানে নরবলি দিত। কালীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির প্রায় সব সময়েই চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি কার্য্যে নিরত লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ইহার দক্ষিণে পশুবলির স্থান। এখানে প্রত্যহ বহু ছাগ বলি হয়। কালীঘাটে নিত্যই লোকের ভিড়, নিত্যই মহোৎসব। তবে শনি ও মঙ্গলবারে, প্রতি অমাবস্যা ও সংক্রান্তিতে, গঙ্গাস্নানের যোগে, কালীপূজার দিন ও মহাষ্টমী উপলক্ষে এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হয়। মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করিবার প্রধান ফটকের বামদিকে অপর একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। বাওয়ালীর জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি পর্ণকুটীরের অনুকরণে বিশুদ্ধ বাংলা পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। কালীঘাটের বর্ত্তমান সেবাইত হালদারগণ এই দেবস্থানের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

কালীঘাটে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। বাহির হইতে আগত যাত্রিগণ তথায় থাকিয়া গঙ্গাস্নান, দেবীদর্শন ও কলিকাতার অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখিতে পারেন।

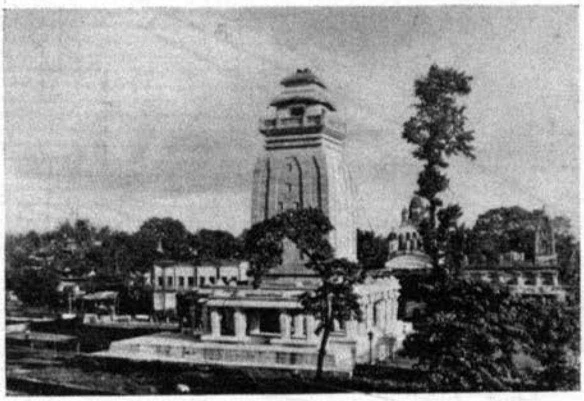
কথিত আছে, কোম্পানির আমলের প্রথমযুগে কোম্পানির তরফ হইতে এই মন্দিরে পূজা দেওয়া হইত। "Life and Times of Carey, Marshman and Ward" নামকগ্রন্থে লিখিত আছে যে একবার ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে তাঁহাদিগের সাফল্যের জন্য পাঁচ হাজার টাকার নৈবেদ্য দিয়া এখানে পূজা দিয়াছিলেন।

কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কনপদ্ধতি বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; অধুনা ইহা শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী সাহানগর বা কেওড়াতলার মহাশ্মশান একটি দ্রষ্টব্য স্থান। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাপ্রাণ অশ্বিনী কুমার দত্ত, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নশ্বরদেহ এইখানেই পঞ্চ ভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

দেশবন্ধুর চিতার উপর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ প্রাচ্য প্রথায় নির্ম্মিত ও ৫৬ হাত উচ্চ। বাঙালী মাত্রেরই এই স্মৃতিসৌধটি দর্শন করা কর্ত্তব্য।

কেওড়াতলার শ্মশানের দক্ষিণে মহিষুরের রাজার স্মৃতিসৌধ ও দেবমন্দির অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। সুন্দর উদ্যান মধ্যে অবস্থিত এই সৌধ ও মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতীয় প্রথায় নির্ম্মিত।



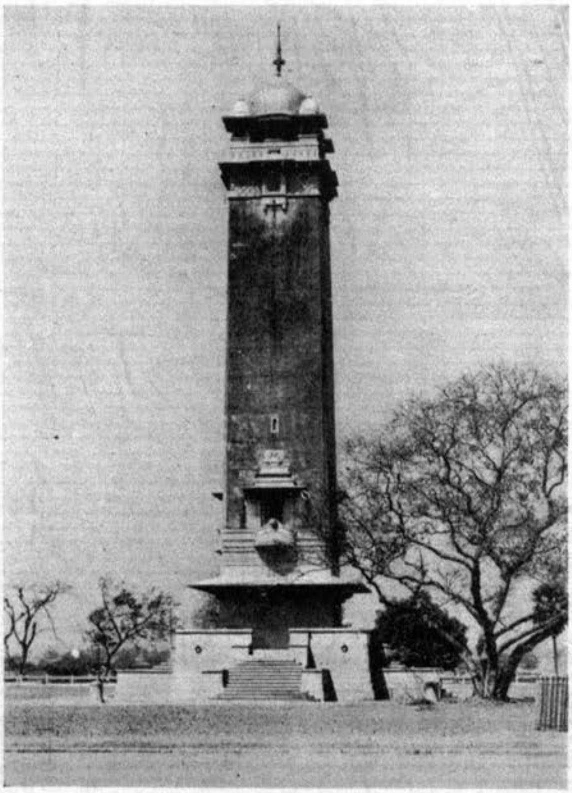
দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ

(১৫) **ঢাকুরিয়া হ্রদ**—কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে ঢাকুরিয়া পল্লীর নিকটে কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাস্ট কয়েকটি কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই অঞ্চল জলাভূমি ছিল। বহু অর্থব্যয়ে এই স্থানকে এখন মনোরম প্রমোদ ভ্রমণের স্থানে পরিণত করা হইয়াছে। প্রধান হ্রদের তীরে একটি য়ুরোপীয় ও একটি ভারতীয় নৌকা-বিহার সমিতি আছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে একটি প্রশস্ত রাজপথ ও কতকগুলি দূর্ব্বাদল-আচ্ছাদিত মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রত্যহ বৈকালে এই স্থানে বায়ু সেবনার্থী বহু নরনারীর সমাগম হয়। হ্রদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং উহাদের একটির উপর একটি সুন্দর মসজিদ আছে। একটি সেতুর উপর দিয়া এই দ্বীপে যাওয়া যায়। সম্প্রতি প্রধান হ্রদের দক্ষিণতটে জাপানীরা একটি বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মন্দিরটিও হ্রদ অঞ্চলের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

(১৬) **হাওড়া**—ইহা গঙ্গার পশ্চিমতীরে কলিকাতা শহরের ঠিক্ বিপরীতদিকে অবস্থিত। ইহা একটি স্বতন্ত্র জেলা হইলেও এবং এখানে পৃথক মিউনিসিপ্যালিটি থাকা সত্ত্বেও ইহাকে কলিকাতার অংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। হাওড়ার পুল নামে পরিচিত সুবিখ্যাত ভাসমান সেতু দ্বারা ইহা কলিকাতার সহিত সংযুক্ত।

হাওড়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে "হাওড়" বা কর্দ্দমাক্ত জলাভূমি হইতেই ইহার নাম হাওড়া বা হাবড়া হইয়াছে। বস্তুতঃ এই জেলায় নিম্নভূমির সংখ্যা খুব বেশী। হাওড়া স্টেশন ছাড়িয়া রেলগাড়ী সামান্য দূর অগ্রসর হইলেই লাইনের দুইদিকে বহু জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হাওড়া পৃথক জেলা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহা কখনও বর্দ্ধমান, কখনও হুগলী এবং কখনও বা ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার এলাকাধীন ছিল।

হাওড়ার রেল স্টেশন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। পূর্ব্বভারত রেলপথ ও বাংলা নাগপুর রেলপথের গাড়ীগুলি এখান হইতে ছাড়ে। বাংলা দেশ হইতে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যাইবার ইহাই সিংহদ্বার।



লস্কর স্মৃতিস্তম্ভ, কলিকাতা ময়দান

হাওড়া শহরের দক্ষিণাংশে বেতোড় নামে একটি স্থান আছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বিপ্রদাসের "মনসা-মঙ্গল" কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস লিখিয়াছেন যে বাণিজ্য যাত্রাকালে চাঁদসদাগর এই স্থানে নৌকা লাগাইয়া বেতাই চণ্ডীর

পূজা করিয়াছিলেন। বেতোড় তখন একটি বড় বন্দর ছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সিজার ফ্রেডারিক নামক ইউরোপীয় পর্যটক বাংলায় আসেন। তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণী হইতে জানা যায় যে সে সময়ে পর্ত্তুগীজগণ প্রতিবৎসর বর্ষাকালে এখানে বাণিজ্য করিতে



গৌড়ীয় মঠ— বাগবাজার

আসিত। তাহারা বেতোড়ে বহু খড়ের চালা নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত বর্ষাকাল অতিবাহিত করিত। বাণিজ্য শেষে চলিয়া যাইবার সময় তাহারা খড়ের ঘরগুলি পোড়াইয়া দিয়া যাইত।

(১৭) **কলিকাতার অন্যান্য দ্রষ্টব্যঃ**--কলিকাতার অসংখ্য দেখিবার বস্তুর মধ্যে উপরে মাত্র কয়েকটি প্রধান বস্তুর উল্লেখ করা গেল। যাঁহাদের অবসর অধিক তাঁহাদের পক্ষে কলিকাতার নিম্নলিখিত বস্তুগুলিও দর্শনীয়। (ক) গঙ্গাতীরে প্রিন্সেপ ঘাটের নিকট ব্রোঞ্জনির্ম্মিত গম্বুজবিশিষ্ট শ্বেত প্রস্তরমণ্ডিত গোয়ালিয়র স্মৃতিস্তম্ভ; ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র যুদ্ধে নিহত সৈনিকগণের স্মৃতি রক্ষার্থে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজগণ ৬৪টি কামান দখল করিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া এই স্মৃতি স্তম্ভের গম্বুজ নির্ম্মিত



লর্ড রবার্টসের প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ চিত্র

হয়। ইহার অল্পদূরে পিতলের গম্বুজবিশিষ্ট গত মহাযুদ্ধে নিহত লস্করদিগের একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। (খ) পোস্তায় জগন্নাথদেবের মন্দির, (গ) নিমতলায় আনন্দময়ী কালী, অতিকায় শিবলিঙ্গ ও মহাশ্মশান; (ঘ) বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠ, মদনমোহন ও সিদ্ধেশ্বরী কালী। কথিত আছে, বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন বিগ্রহকে বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট বন্ধক রাখিয়া এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লন। রাজা যখন উহা ফেরত লইতে আসেন গোকুল মিত্র তখন ঠিক

তদ্রূপ আর একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আসল বিগ্রহের পরিবর্ত্তে রাজাকে উহা প্রদান করেন। রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আসল মদনমোহন মিত্র মহাশয়ের গৃহেই থাকিয়া যান। সিদ্ধেশ্বরী কালীর সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে ইহা একজন সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্র ওরফে "কাল জমিদার" ইহার জন্য একটি সু-উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহা অক্টারলোনী মনুমেণ্ট্ অপেক্ষাও উচ্চ ছিল বলিয়া কথিত। ইংরেজেরা এই মন্দিরকে "ব্ল্যাক্ প্যাগোডা" বা গোবিন্দরাম মিত্রের প্যাগোডা বলিতেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মন্দির পড়িয়া গেলে গোবিন্দরামের বংশধর অভয়চন্দ্র মিত্র বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করান।

(ঙ) চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির, (চ) টালার জলের ট্যাঙ্ক, (ছ) বেল-গেছিয়ায় দিগম্বর জৈন মন্দির, ভেটারিনারী কলেজ ও কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। (জ) শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্ক। (ঝ) এজরা স্ট্রীটে পার্শীদের অগ্নিমন্দির। (ঞ) মুর্গি-হাটায় ইহুদীদের সিনাগগ্ বা গির্জ্জা। (ট) রেড রোডে অবস্থিত লর্ড রবার্টস্, হার্ডিং, কিচনার, ল্যান্সডাউন, মিণ্টো প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখিবার মত। অশ্বারূঢ় লর্ড রবার্টসের মূর্ত্তিটি আফগান্ যুদ্ধে অধিকৃত ১৪টি কামান হইতে ঢালাই করা, লর্ড রবার্টস্ আফগান্দের মেষচর্ম্মের কোট পরিহিত। মূর্ত্তির পাদপীঠের চারিদিকে সৈনিকগণের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহার পশ্চাদ্দিকে যুদ্ধের ও সম্মুখভাগে যুদ্ধজয়ের যে চিত্র আছে তাহা ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। (ঠ) চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আউট্রামের মূর্ত্তি। ইহা গত শতাব্দীতে নির্ম্মিত পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অশ্বারূঢ় মূর্ত্তিগুলির অন্যতম। ভাস্করের নাম জন্ হেন্‌রী ফোলী, ইহার নির্ম্মিত অনেক মূর্ত্তি বিলাতে আছে।

(ড) বালীগঞ্জে মহানির্ব্বাণ মঠ। (ঢ) ভবানীপুরে আশুতোষ ইন্‌স্টিটুট্ ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। (ণ) লোয়ার সার্কুলার রোডে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি। (ত) আলিপুরে হর্টিকাল্‌চারাল গার্ডেন। (থ) টালীগঞ্জে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও রাস-মন্দির। (দ) ঢাকুরিয়ায় যোধপুর ক্লাব। (ধ) পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে হিন্দু স্টুয়ার্টের স্মৃতি-সৌধ ইত্যাদি। স্টুয়ার্ট সাহেব প্রথমে সৈনিক বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুরা নাম ছিল মেজর জেনারেল চার্লস্ স্টুয়ার্ট। আয়ার-ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহর তাঁহার জন্মস্থান। হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ন্যায় সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সমাধির উপর স্মৃতি-সৌধটি হিন্দু মন্দিরের প্রথায় নির্ম্মিত।

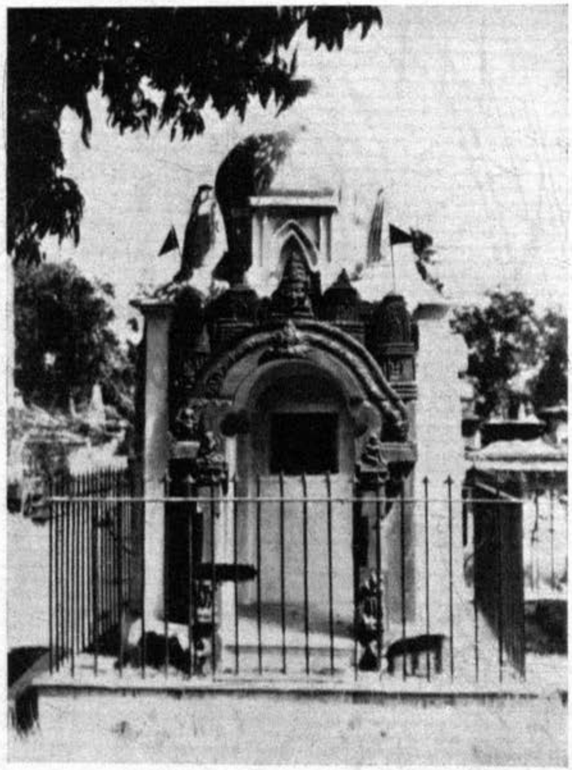
এই সকল ছাড়া বাংলার গৌরব বিখ্যাত মনীষিগণ যে সকল স্থানে বাস করিতেন তাহাও শ্রদ্ধার সহিত দর্শনীয়।

রাজা রামমোহন রায় ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বাস করিতেন। এখানে মর্ম্মর-ফলক স্থাপিত আছে। ইহার পূর্ব্বে তিনি ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোড ভবনে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে এখানে পুলিশের থানা অবস্থিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাসভবন ছিল বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে। এখানেও মর্ম্মর-ফলক আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ৫নং প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি লেনে বাস করিতেন। মর্ম্মর-ফলকে ইহা উৎকীর্ণ আছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর পদ্মপুকুরের দক্ষিণে বাস করিতেন। এখানেও মর্ম্মর-ফলক আছে



হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধি

কেশবচন্দ্র সেন ৭৮ নং আপার সার্কুলার রোড কমল কুটীরে বাস করিতেন। এখানেও স্মৃতি-ফলক আছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে বাস করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্রগণের ইহা বসতবাটী।

কলিকাতার পারিপার্শ্বিক দ্রষ্টব্যঃ—

(ক) **বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর**—হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী চাঁদপাল ঘাট হইতে ফেরী স্টীমারযোগে অথবা হাওড়া হইতে ট্রামে শিবপুর হইয়া বোটানিক্যাল

গার্ডেনে যাইতে হয়। এই উদ্যানটি গঙ্গার ঠিক উপরেই ২৭২ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল কিডের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও লতার নমুনা আছে। গঙ্গাতীর হইতে উদ্যান মধ্যবর্ত্তী পামবীথিযুক্ত প্রশস্ত পথটি, মনোরম অর্কিড হাউসগুলি ও দেড়শত বৎসরের প্রাচীন একটি বিশাল বটবৃক্ষ এখানকার প্রধান আকর্ষণ। এই বটবৃক্ষের কাণ্ড হইতে প্রায় ৩০০ জট বা শিকড় বাহির হইয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ৯০০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এক খণ্ড জমির উপর এই বটবৃক্ষটি দণ্ডায়মান। কথিত আছে এই স্থানে উদ্যান নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই বটবৃক্ষের তলায় জনৈক সন্ন্যাসী বাস করিতেন।



প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ—বোটানিক্যাল উদ্যান

বোটানিক্যাল উদ্যানটি বেশ নিরিবিলি। প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহা বিনা দর্শনীতে সাধারণের জন্য খোলা থাকে। এই উদ্যানের নিকটেই শিবপুরের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ অবস্থিত। কলেজ রোড নামক রাজপথের উপর "নিম্বার্ক আশ্রম" নামে একটি বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান আছে। পরলোকগত বাঙালী সন্ন্যাসী মহন্ত সন্তদাসজী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সংসারাশ্রমে সন্তদাসজীর নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি বৃন্দাবনস্থ চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের অধিনেতা বা মহন্তের পদে বৃত হন। তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙালী সন্ন্যাসী এই সম্মান লাভ করেন নাই।

(খ) **বরাহনগরের শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির**—কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে অবস্থিত বরাহনগরের মালিপাড়া নামক পল্লীতে ভাগবত আচার্য্যের পাটবাড়ী নামে পরিচিত একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট আছে। চৈতন্যদেব এই পাটবাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানে একটি মন্দিরে গৌর-নিতাই-এর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির সংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্নে বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ হয়। পাটবাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব মিউজিয়ম একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এই গ্রন্থাগারে বহু মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থ আছে। তাহা ছাড়া শ্রীচৈতন্য দেবের হস্তাক্ষর, বৈষ্ণব মহাজনগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও বহু তীর্থের রজ ও স্মৃতিচিহ্ন এখানে সংগৃহীত আছে। ইহা একটি দেখিবার মত প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন স্মরণ উপলক্ষে একটি বিরাট মহোৎসব হয়।

(গ) **দমদম**—পূর্ব্বে এখানে ছাউনি ছিল। উড়োজাহাজে উঠানামার জন্য এখানে একটি প্রকাণ্ড এরোড্রোম আছে।

(ঘ) **দক্ষিণেশ্বর**—শিয়ালদহ হইতে ট্রেণ ও মোটর বাস যোগে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া যায়। ট্রেণে গেলে সুবিখ্যাত ওয়েলিংডন ব্রিজের নিকটে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নামিতে হয়। রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যাণ্ড হইতে দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত কালীবাড়ী মাত্র দুই তিন মিনিটের পথ। কালীবাড়ী গঙ্গার ঠিক্ উপরেই অবস্থিত। বাঁধাঘাট, চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দিরযুক্ত এই কালীবাড়ীর দৃশ্য গঙ্গাবক্ষ হইতে অতি সুন্দর। কলিকাতা জানবাজারের পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি এই কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। মহামানব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন পীঠ হিসাবে বর্ত্তমানযুগে এই কালীবাড়ী তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের বাস-কক্ষটিতে তাঁহার শয্যা ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখা আছে। রামকৃষ্ণদেবের সাধন বেদী ও পঞ্চবটী এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। কালীমন্দিরের চূড়ার সংখ্যা নয়টি, ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও উত্তরদিকে রাধাকৃষ্ণের মন্দির অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গনের বিস্তৃত স্থান লালরঙের টালির দ্বারা আবৃত। দক্ষিণেশ্বরে যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কালীবাড়ী হইতে কিছু দূরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মধ্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত আদ্যাপীঠ ও তৎসংলগ্ন মাতৃ-আশ্রম, বালক-আশ্রম প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলি দক্ষিণেশ্বরের অপরাপর দ্রষ্টব্য।

(ঙ) **ওয়েলিংডন ব্রিজ**—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঠিক পার্শ্বে এই প্রকাণ্ড রেলওয়ে সেতুটি অবস্থিত। ইহার চলিত নাম বালী ব্রিজ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয় এবং ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন ইহার উদ্বোধন করেন। তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হয় ওয়েলিংডন ব্রিজ। গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত ৩৫০ ফুট অন্তর সাতটি স্তম্ভের উপর ইহা নিৰ্ম্মিত। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা একটি বিখ্যাত রেলওয়ে সেতু। প্রায় চারি কোটি টাকা ব্যয়ে ইহা নিৰ্ম্মিত। ইহার উপর দুইটি রেলওয়ে লাইন ছাড়া দুই দিকে মোটরগাড়ী প্রভৃতি যাতায়াতের পথ ও পদচারীদের জন্য ফুটপথ আছে। গ্রীষ্মকালের বৈকালের দিকে অনেকে ইহার উপর বেড়াইতে যান। পদচারীদিগকে এই সেতু অতিক্রম করিতে হইলে দুই পয়সা মাশুল দিতে হয়।

(চ) **ওয়েলিংডন রীচ**—বালী ব্রিজের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গঙ্গাগর্ভে জলের উপর বিমান যান অবতরণ করিবার জন্য একটি স্থান আছে, উহা ওয়েলিংডন রীচ নামে পরিচিত।

(ছ) **বেলুড়মঠ :**—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দক্ষিণেশ্বরের অনতিদূরে বেলুড়মঠ অবস্থিত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করেন। সম্প্রতি এখানে একটি প্রস্তর মণ্ডিত বৃহৎ মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের চিতাভস্মের উপর সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশে এত বড় মন্দির আর নাই। নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির অবস্থিত। (পূর্ব্বভারত রেলপথের "বেলুড়" স্টেশন দ্রষ্টব্য।)

কলিকাতা ও হাওড়ার সহিত লাইট রেলওয়ের দ্বারা সংযুক্ত প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ক) বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে

কলিকাতার বেলগাছিয়া (ট্রাম ডিপোর নিকট) হইতে মার্টিন কোম্পানির এই ছোট মাপের রেলপথটি ৪৩ মাইল দূরবর্ত্তী ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের হাসনাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেল স্টেশনটি বেলগাছিয়ায় অবস্থিত হইলেও উহার নাম শ্যামবাজার। এই স্থান হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী বেলিয়াঘাটা ব্রীজ হইতে এই রেলপথের এক শাখা ৯ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের খুলনা শাখার বারাসাত জংশনে গিয়া মিলিত হইয়াছে। এই রেলপথে হাড়োয়াখাল, দেগঙ্গা, ধানকুড়িয়া গাইন গার্ডেন, আড়বালিয়া, শীকরা-কুলীনগ্রাম, বসিরহাট, দণ্ডীরহাট, টাকী রোড ও হাসনাবাদ উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

হাড়োয়াখাল—কলিকাতা হইতে ১১ মাইল দূর। হাড়োয়ায় বিখ্যাত পীর গোরাচাঁদ বা গোড়াই গাজীর সমাধি অবস্থিত। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ১২ই তারিখে গোড়াই গাজীর মৃত্যু তিথিতে এখানে মুসলমানগণের একটি বৃহৎ মেলা হয়। গোড়াই গাজী সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। জনশ্রুতি যে তিনি একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন ও তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি বালাণ্ডা পরগণার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী দেউলিয়ায় উপস্থিত হন ও তাঁহাকে মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। চন্দ্রকেতু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার না করায় তিনি তাঁহাকে স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কথিত আছে তাঁহার প্রভাবে একটি লৌহখণ্ড একটি সুপক্ক কদলীতে পরিণত হয় ও একজন মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিয়াও কিন্তু চন্দ্রকেতুর মন টলিল না। তিনি গোড়াই গাজীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। চন্দ্রকেতুর সহিত আটিয়া উঠিতে না পারিয়া গোড়াই গাজী সুন্দরবনের হাতিয়াগড় অঞ্চলে ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। সেখানে তখন রাজা মহীদানন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র অকানন্দ ও বকানন্দ মহাবীর ছিলেন। তাঁহাদের সহিত গোড়াই গাজীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে বকানন্দ গোড়াই গাজীর হস্তে নিহত হইলেন, কিন্তু গোড়াই গাজীও গুরুতররূপে আহত হইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবার জন্য তাঁহার অনুচরের নিকট একটি পান চাহিলেন। হাতিয়াগড়ে তখন পান না মিলায় আহত গোড়াই গাজী রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কুলটি-বিহারী নামক গ্রামে আসিয়া এক নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। কালুঘোষ নামক জনৈক গোয়ালার গাভী আসিয়া প্রত্যহ তাঁহার মুখে দুগ্ধধার বর্ষণ করিয়া যাইত। কথিত আছে, যে অন্যের অলক্ষিতে সপ্তাহকাল এইরূপে দুগ্ধ পান করিতে পারিলে তিনি নাকি সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু সপ্তম দিনে কালু ঘোষ গাভীর অনুসরণে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করায় গোড়াই গাজী বুঝিলেন

যে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত। তখন কালু ঘোষকে তিনি উপদেশ দিলেন যে সে যেন তাঁহার মৃত দেহ হাড়োয়ায় আনিয়া সমাধি দেয়। গোড়াই গাজীর হাড় হইতে স্থানের নাম হাড়োয়া হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কালু ঘোষ হিন্দু হইয়াও একজন মুসলমানকে কবর দিয়াছিল এই অপরাধে তাহার জনৈক প্রতিবেশী তাহাকে প্রায়ই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কালু ঘোষ একদিন তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। নরহত্যার অপরাধে ধৃত হইয়া কালু ঘোষ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীনের নিকট নীত হইলে তাহার স্ত্রী পীর গোরাচাঁদের সমাধির পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। কথিত আছে পীর গোরাচাঁদ কবর হইতে উঠিয়া গৌড়ে গমন করেন এবং কালু ঘোষকে মুক্তি দিবার জন্য আলাউদ্দীনকে অনুরোধ করেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আলাউদ্দীন অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং কালু ঘোষকে মুক্তি দেন। অতঃপর তিনি গোরাচাঁদের সমাধির উপর একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ১৫০০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। কালু ঘোষের বংশধরগণ বহুকাল ধরিয়া এই সমাধির সেবায়েত ছিল। বর্ত্তমানে এই বংশের অস্তিত্ব নাই। বাংলা দেশের নানা স্থানে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা দেখিতে পাওয়া যায়।

দেগঙ্গা—বা দ্বিগঙ্গা কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাস পেরিপ্লাসে উল্লিখিত গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া নগরী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। দেগঙ্গা শব্দটি দেবগঙ্গা, দ্বীপগঙ্গা অথবা দীর্ঘগঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ। দেগঙ্গার নিকটে বহুবিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ ও প্রাচীন দীর্ঘীকা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। ইহা দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া কথিত। চন্দ্রকেতুর সহিত গোড়াই গাজীর সংঘর্ষের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রকেতুকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া গোড়াই গাজী গৌড়ের বাদশাহের সহায়তা প্রার্থনা করেন। বাদশাহ পীরশাহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে বালাণ্ডা পরগণার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। পীরশাহ আসিয়াই গোড়াই গাজীর পরামর্শমত চন্দ্রকেতুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। চন্দ্রকেতু এই প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। তখন পীরশাহের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে চন্দ্রকেতু জয়লাভ করেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার বিজয়ের বার্ত্তাবাহী শ্বেত পারাবতের পরিবর্ত্তে পরাজয়ের নিদর্শন কৃষ্ণ পারাবত উড়িয়া অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করে। যুদ্ধে চন্দ্রকেতু পরাস্ত হইয়াছেন মনে করিয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা দীঘিতে ডুবিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেন। বিজয়ী চন্দ্রকেতু গৃহে ফিরিয়া এই শোচনীয় ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেও আত্মহত্যা করেন। পারাবত বিভ্রাটের ফলে সেকালের বহু রাজবংশের এইভাবে ধ্বংস হওয়ার কাহিনী অবগত হওয়া যায়। রাজারা যুদ্ধযাত্রার সময়ে একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণ কবুতর সঙ্গে লইয়া যাইতেন। শ্বেত কবুতরটি জয়ের ও কৃষ্ণ কবুতরটি পরাজয়ের বার্ত্তাবহরূপে গণ্য হইত। যখন যুদ্ধজয়ের আর কোনই আশা থাকিত না তখন রাজার নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার কোন প্রিয় অনুচর কৃষ্ণ কবুতরটিকে ছাড়িয়া দিত। শিক্ষিত কবুতর উড়িয়া অন্তঃপুরে আগমন করিলে রাণী ও অন্যান্য পুরবাসিনীগণ সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী কোন দীর্ঘীকায় ডুবিয়া মরিয়া অত্যাচারীগণের হাত হইতে নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন।

দেগঙ্গার নিকটবর্ত্তী বালাণ্ডাও একটি প্রাচীন স্থান। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে ইহা নিম্নবঙ্গের "বালবল্লভী" রাজ্যের রাজধানী ছিল। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট বালাণ্ডার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভবদেব যেরূপ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তেমনই দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি "বালবলভীভুজঙ্গ" উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন। ভবদেব ভট্টের পদ্ধতি অনুসারে এখনও ব্রাহ্মণগণের দশকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। ভুবনেশ্বরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাঁহার বংশের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বকালে বালাণ্ডা অতি উৎকৃষ্ট মছলন্দ বা মাদুরের জন্য বিখ্যাত ছিল।

ধানকুড়িয়া—কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দূর। এখানকার রেল স্টেশনের নাম ধানকুড়িয়া গাইন গার্ডেন। স্টেশনের সম্মুখেই ইংরেজী ক্যাস্‌ল্‌এর অনুকরণে নির্ম্মিত গাইন বাবুদের সুন্দর বাগান বাটী দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় ধানকুড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন। সততা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা শ্যামাচরণ অতি দীন অবস্থা হইতে বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠেন। পাটের ব্যবসায়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর দয়ালু ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। একবার ২৪ পরগণা জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় পত্নীর উৎসাহে নিজের বাড়ীতে একটি অন্নসত্র খুলেন এবং এক বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া প্রত্যহ অন্যূন দুই হাজার নরনারীকে অন্নদান করেন। ধানকুড়িয়া গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা আছে। ১৩০৫ সালে শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় পরলোক গমন করেন। মদনমোহনের মন্দির ধানকুড়িয়ার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

আড়বালিয়া ও শীকরাকুলীন গ্রাম—কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ২৮ ও ৩০ মাইল দূর। এই দুই গ্রামে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির বাস। আড়বালিয়ার জ্ঞান বিকাশিনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ইহা ২৪ পরগণা জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

বসিরহাট—কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূর। ইহা ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি ইছামতী বা যমুনা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। বসিরহাট শহরে একটি প্রাচীন মস্‌জিদ্ আছে, উহা সালিক মস্‌জিদ্ নামে পরিচিত। মস্‌জিদ্‌টির পরিমাণ ফল ৩৬ ফুট × ২৪ ফুট; দুইটি কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর স্তম্ভের উপর ছয়টি গুম্বজ বিশিষ্ট এই মস্‌জিদ্‌টি ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে উলুগ মজলিস্-ই-আজম নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত **ভাবলা** গ্রাম পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান।

দণ্ডীরহাট—কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল দূর। ইহা বসিরহাট মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পরলোকগত খ্যাতনামা চিকিৎসক জগবন্ধু বসু মহাশয় দণ্ডীরহাটের অধিবাসী ছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রবাদের ন্যায় এখনও

লোকের মুখে মুখে ফিরে। কথিত আছে যে তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন না করিয়া সন্দেশ খাইবেন না, এবং কার্য্যতঃ সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়াছিলেন।

টাকী রোড—কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল দূর। এখানে নামিয়া ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম বিখ্যাত স্থান টাকী যাইতে হয়। টাকীর জমিদারগণ যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর। এই বংশের স্বর্গীয় কালীনাথ মুন্সী মহাশয় দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে জনৈক ব্রাহ্মণের ফাঁসির হুকুম হইলে কালীনাথ প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

হাসনাবাদ—কলিকাতা হইতে ৪৩ মাইল দূর। এই স্থানটি ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত ও সুন্দরবন অঞ্চলের একটি বিখ্যাত গঞ্জ। কোম্পানির আমলে এখানে একটি লবণের কারখানা ছিল। শ্রীরামপুর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী পাদরি কেরি সাহেব এক সময়ে গুরু ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া হাসনাবাদের নিমক-কুঠিতে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি ৪০ একর জমি লইয়া চাষ আবাদ আরম্ভ করেন ও একখানি পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বসতি করেন। প্রায় এক বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিবার পর তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয় ও তিনি কোম্পানির অধীনে একটি কার্য্য পাইয়া ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সপরিবারে মালদহে চলিয়া যান। সেকালে হাসনাবাদে ব্যাঘ্রের বড় উপদ্রব ছিল। নিমক-কুঠির কুঠিয়াল শর্ট সাহেবের ও কেরির বন্দুক থাকায় ব্যাঘ্রভীতি অনেকটা নিবারিত হয় এবং দলে দলে বহুলোক আসিয়া হাসনাবাদে বসতি স্থাপন করে। হাসনাবাদ হইতে নৌকাযোগে সুন্দরবনের বহু স্থানে যাওয়া যায়।



(খ) কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ে

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের বজবজ লাইনের মাঝের আট জংশন হইতে আরম্ভ হইয়া এই ছোট মাপের (ন্যারো গেজ্) রেলপথটি গঙ্গাতীরবর্ত্তী ফলতা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ম্যাক্লাউড কোম্পানি এই রেলপথের তত্ত্বাবধারক। মাঝের আট জংশন হইতে ফলতা ২৭ মাইল দূর। এই রেলপথে ঘোলসাহাপুর, সখেরবাজার, উদয়রামপুর, আমতলা হাট ও ফলতা উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

ঘোলসাহাপুর—স্টেশনটি **বেহালা** গ্রামের অন্তর্গত। বেহালা অতি প্রাচীন গ্রাম। কথিত আছে, ভেলার উপর মৃত পতি লখিন্দরের শবদেহ লইয়া বেহুলা অনেক দিন এই স্থানে অবস্থান করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অনুসারে গ্রামের নাম বেহুলা বা বেহালা হয়। "কালীক্ষেত্র দীপিকা" নামক পুস্তকে এই স্থান বহুলা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বেহালা গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। বেহালা হরিসভার নিকটে ধর্ম্মতলায় একটি ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির ও তন্মধ্যে কচ্ছপাকৃতি এক ধর্ম্মমূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরে যে অষ্টভুজা চণ্ডীমূর্ত্তি আছে, বিশেষজ্ঞদের মতে যবদ্বীপের ব্রহ্মবনে তদনুরূপ আর একটি মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরে একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের নিকটে একটি প্রাচীন ও বিশাল দীঘির অবশিষ্টাংশ আজিও বিদ্যমান। বেহালার অন্তর্গত চণ্ডীতলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার বহু মহিলা যাত্রীর সমাগম হয়। "কলিকাতার একাল ও সেকাল" প্রণেতা বিখ্যাত ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বেহালার অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতা হইতে বেহালা পর্য্যন্ত ট্রাম লাইন আছে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটি এখন শহরে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি বেহালায় "গ্রেহাউণ্ড রেসিং ষ্টেডিয়ম" বা কুকুরদৌড়ের মাঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই একমাত্র কুকুর-দৌড়ের মাঠ। "কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়" নামক প্রতিষ্ঠানটিও বেহালা গ্রামে অবস্থিত।

সখেরবাজার—মাঝের আট জংশন হইতে ৩ মাইল দূর। ইহা **বড়িষা** গ্রামের অন্তর্গত। বেহালার ন্যায় বড়িষাও একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ রায় কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কালীঘাট পূর্ব্বে এই বংশের সম্পত্তি ছিল। এই বংশীয় মনোহর, রামচাঁদ ও রামভদ্র প্রভৃতির নিকট হইতে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা ক্রয় করেন। বড়িষার নিকটে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের রাজধানী ও রায়গড় নামক দুর্গ অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে উহাদের চিহ্ন মাত্র নাই। দ্বারির জাঙ্গাল নামক একটি প্রাচীন রাস্তার ভগ্নাবশেষ এখনও প্রাচীন যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

উদয়রামপুর—মাঝের আট জংশন হইতে ১১ মাইল দূর। স্টেশনের নাম উদয়-রামপুর হইলেও বিষ্ণুপুরই এই অঞ্চলের বিখ্যাত স্থান। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবর পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা আছে গ্রামটি তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে

"বিষ্ণুপুর শিক্ষা সঙ্ঘ" নামক খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও উপনিবেশ আছে। শহরের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এই স্থানটির অবস্থান অতি সুন্দর।

আমতলা হাট—মাঝের আট জংশন হইতে ১২ মাইল দূর। এখানে বেশ একটি বড় বাজার আছে ও সপ্তাহে দুই দিন করিয়া প্রকাণ্ড হাট বসে। কলিকাতা হইতে বহু ভদ্র লোক আসিয়া এই স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করায় ইহা ক্রমশঃ একটি ছোটখাট শহর হইয়া উঠিতেছে।



ফলতা দুর্গের প্রবেশদ্বার

ফলতা—মাঝের আট জংশন হইতে ২৭ মাইল দূর। ইহা হুগলী বা ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। ফলতা বন্দরের বিপরীত দিকে দামোদর নদ আসিয়া ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ফলতার বাজার হইতে সামান্য দক্ষিণ দিকে দামোদর সঙ্গমের ঠিক সম্মুখে একটি পরিত্যক্ত দুর্গ আছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করিলে কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসিগণ পলাইয়া গিয়া ফলতার

দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে থাকিয়াই ইংরেজগণ সৈন্যসংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ফলতায় ওলন্দাজদিগের একটি কুঠি ও পোতাশ্রয় ছিল। ফলতার দুর্গটি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হয়। এই দুর্গটি গোলাকার, ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পরিখায় এখনও গভীর জল থাকে। পরিখার সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ আছে। দুর্গের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। শত্রুর



ফলতা দুর্গের পরিত্যক্ত কামান

প্রবেশ রোধ করিবার জন্য এই দ্বার ইচ্ছামত টানিয়া তুলিতে পারা যাইত। ইহার লৌহশৃঙ্খল প্রভৃতি এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। প্রবেশ তোরণের দ্বিতল গৃহটি এখন ফলতার "ইনস্‌পেকশন বাংলো" রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই দুর্গের বহিঃ প্রাকার মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও ভিতরের প্রাকার ইষ্টকের দ্বারা প্রস্তুত। উভয় প্রাকারের বহু অংশ

এখনও অভগ্ন আছে, এমন কি অনেকগুলি কক্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে নানা প্রকার তৃণগুল্ম প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় ইহা সর্প প্রভৃতির আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। দুর্গের মধ্যস্থলে উচ্চ বুরুজের উপর একটি জাহাজের পথ নির্দ্দেশক স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। এখনও বড় বড় দুইটি কামান এই দুর্গের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

ফলতায় অতি বিস্তৃত ধানের কারবার আছে। সম্প্রতি ইহার নিকটে কয়েকটি ধান কল বসিয়াছে। গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার ন্যায় ফলতা বন্দরেও পাকা পোস্ত বাঁধান আছে। ইহা বাংলা সরকারের খাস মহালের অন্তর্গত। ফলতার নীচে গঙ্গার বিস্তৃতি প্রায় দুই মাইল। এই স্থানের দৃশ্যও যেরূপ সুন্দর, স্থানটিও তেমনি স্বাস্থ্যকর।



ফলতার বন্দর

পরলোকগত বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের "মায়াপুরী" নামক কানন ফলতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। এই মনোরম উদ্যানটি গঙ্গার ঠিক উপরেই অবস্থিত। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র এই নির্জ্জন কাননে বসিয়া উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্য গবেষণা করিয়া সমগ্র সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য এখানে বহু দেশের বহুবিধ তরুলতা সংগৃহীত আছে।

(গ) হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা

লাইট রেলওয়ে

এই ছোট মাপের রেলপথ দুইটি মার্টিন কোম্পানি কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত ও পরিচালিত। হাওড়াঘাট (তেলকলঘাট) হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা হাওড়া শহরের উপকণ্ঠস্থ কদমতলা জংশনে আসিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি লাইন হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা ও অপরটি হুগলী জেলার অন্তর্গত শিয়াখালা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

হাওড়া-আমতা রেলপথে মাকড়দহ, ডোমজুড়, বড়গাছিয়া জংশন, মুন্সীরহাট ও আমতা উল্লেযোগ্য স্টেশন।

মাকড়দহ—হাওড়াঘাট হইতে ৮ মাইল দূর। এই স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাকড়চণ্ডীর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। মাকড়চণ্ডী দেবী শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। পূর্ব্বকালে এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়াই সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। সরস্বতী এখন মজিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নদী দিয়াই সপ্তগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যপোত সকল যাতায়াত করিত।

ডোমজুড়—হাওড়াঘাট হইতে ১০ মাইল দূর। ইহাও সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান পাটের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে আতসবাজী, সোলার টুপি ও তালাচাবী তৈয়ারী হয়। এই স্থানে বহু পানের বরজ আছে।

বড়গাছিয়া জংশন—হাওড়াঘাট হইতে ১৬ মাইল দূর। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী **চাঁপাডাঙ্গা** পর্য্যন্ত গিয়াছে। বড়গাছিয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান। এখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা ও সবরেজিষ্ট্রী আফিস প্রভৃতি আছে। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী কমলাপুর গ্রাম বাংলার বিখ্যাত যাদুবিদ্যাবিশারদ আত্মারাম সরকারের জন্মস্থান। কাহাকে কোনরূপ অদ্ভুত কিছু করিতে দেখিলে লোকে এখনও কথায় বলে "আত্মারাম সরকারের ভেল্কি"।

মুন্সিরহাট—হাওড়াঘাট হইতে ১৯ মাইল দূর। ইহা এতদঞ্চলের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার হাট খুব প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে মোটর বাস যোগে প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজধানী ও মহাকবি ভারত চন্দ্রের জন্ম স্থান **পেঁড়োর গড়**

বা পেঁড়ো-বসন্তপুরে যাওয়া যায়। মুন্সীরহাট হইতে পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পেঁড়োর গড়ের ধ্বংসাবশেষ কাণা নদীর উপর অবস্থিত। আদিশূর বংশীয় যামিনীশূর যখন অপার মন্দারের (বর্ত্তমান গড় মান্দারণ) রাজা তখন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের কায়স্থ রাজা পাণ্ডুদাস তাঁহার সামন্ত নৃপতি ছিলেন। মাদারিয়া খাল বা রোণ নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুদাসের রাজধানী তাঁহার নাম অনুসারে পাণ্ডুয়া নামে পরিচিত হয়। গড়মান্দারণ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ-নন্দিনীতে" ইহার বর্ণনা আছে। পেঁড়ো শব্দটি পাণ্ডুয়া শব্দের অপভ্রংশ। তৎকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও ধনী বণিক বা শ্রেষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল। ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদিগের বাসস্থান বলিয়া ইহার নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ হয়। বর্ত্তমানে ইহা **ভুরশুট** বা **ভুরশো** নামে পরিচিত।

রাজা পাণ্ডুদাস বিশেষ ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য "ন্যায়-কন্দলী" প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধর ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য্য তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে চন্দেলরাজ যশোবর্ম্মা মিথিলা ও গৌড় জয় করেন এবং ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। চন্দেল রাজের সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। পাণ্ডুদাসের বংশধরগণ হীনবল হইয়া পড়িলে বাগদী জাতীয় বীর শনি ভাঙড় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য জয় করেন। রোণ নদের তীরে **দিল্-আকাশ** নামক স্থানে তিনি তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী এক অরণ্য মধ্যে তিনি এক ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিকট নরবলি দিতেন। এই দেবী এখনও দিল্-আকাশে পূজিত হইতেছেন। একবার দেবীর সম্মুখে অষ্টমবর্ষীয় এক ব্রাহ্মণ কুমারকে বলি দিবার জন্য উপস্থিত করা হইলে বাগদী রাজার কাপালিক গুরু স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন ও স্বয়ং তাঁহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করেন ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণকুমার শনি ভাঙড়কে পরাজিত করিয়া স্বয়ং ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজা হন। ইনি চতুরানন নিয়োগী নামে পরিচিত ছিলেন। চতুরানন রাজ্য অধিকার করিয়া বর্ত্তমান পেঁড়ো হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে ভবানীপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গড়ভবানীপুর নামে পরিচিত। চতুরাননই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজা উপাধি লাভ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠের অধিপতি হন। এই বংশীয়গণ বহুকাল ধরিয়া গড়ভবানীপুর ও পেঁড়ো বসন্তপুরে রাজত্ব করেন। উত্তরকালে নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সহায়তায় বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র গড়ভবানীপুরের শেষ রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং গড়ভবানীপুর ও পেঁড়োর গড় হস্তগত করেন। পেঁড়োর গড়ের শেষ রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর নষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পাঠান আমলে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। মুঘলযুগে সম্রাট আকবরের সময় ইহা নামে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও কার্যতঃ স্বাধীনই ছিল। তৎকালে মুঘল দরবারে ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজকে বার্ষিক একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ছাগল ও একখানি কম্বল রাজকর স্বরূপ দিতে হইত। সম্রাট আকবরের সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী ভবশঙ্করী ভূরিশ্রেষ্ঠের অধিশ্বরী হন। তিনি অতি তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। মুঘল অধিকার হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধনের জন্য পাঠান সর্দ্দার ওসমান রাণী ভবশঙ্করীকে সসৈন্যে পাঠানদলে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি ইহাতে অস্বীকৃতা হইলে ওসমান বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে গড়ভবানীপুর হইতে প্রায় ১৪।১৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাসডিঙ্গা গড়ের দেবমন্দির আক্রমণ করেন। ওসমান পূর্ব্ব হইতেই খবর পাইয়াছিলেন যে সেদিন অমাবস্যার রাত্রিতে রাণী ভবশঙ্করী তথাকার দেব মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। অতি অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী সৈন্যের সহায়তায় রাণী ভবশঙ্করী অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং অমিত বিক্রমে পাঠান বাহিনীকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করেন। গুণগ্রাহী সম্রাট আকবরের কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রাণী ভবশঙ্করীর অপূর্ব্ব বীর্য্যবত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "রায় বাঘিনী" উপাধি প্রদান করেন।

কেহ কেহ বলেন যে হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী ইতিহাসবিশ্রুত কালাপাহাড় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকুল সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রাজীবলোচন রায় এবং তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণের সেনাপতি ছিলেন। পাঠান নবাব সুলেমান কররানি সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিলে মহাবীর রাজীবলোচন ওড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব ও ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ রায়ের সেনাবাহিনী লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। সুলেমান সন্ধি করিতে বাধ্য হন। রাজীবলোচনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে গৌড়ে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। সেখানেও রাজীবলোচন অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। একদিন পশুশালার পিঞ্জর হইতে একটি ব্যাঘ্র কোনরূপে বাহির হইয়া পড়ে। রাজীবলোচন উহাকে ধরিয়া পুনরায় পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করান। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া নবাবকন্যা তাঁহার প্রেমে পড়েন। বহু ইতস্ততঃ করিয়া রাজীবলোচন অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করেন। হিন্দু হইয়া মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করায় রাজীবলোচন স্বসমাজ কর্ত্তৃক অপমানিত ও ধিক্কৃত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং দারুণ হিন্দু বিদ্বেষী হইয়া পড়েন। সুলেমানের সেনা বাহিনী লইয়া তিনি ওড়িষ্যা জয় করেন এবং তথাকার বহু দেবমন্দির কলুষিত ও দেববিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। কথিত আছে যে তাঁহার ভয়ে পাণ্ডাগণ জগন্নাথ দেবকে লইয়া চিল্কা হ্রদের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। তিনি চিল্কা হইতে জগন্নাথ বিগ্রহকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ত্রিবেণীতে আনিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন এবং গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেন। সেই অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড উদ্ধার করিয়া পরে জগন্নাথ দেবের নূতন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করা হয়। কালাপাহাড় পূর্ব্ব দিকে কামরূপ কামাখ্যা পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। দেশের বহু স্থানে বহু অঙ্গহীন দেববিগ্রহ কালাপাহাড়ী অত্যাচারের স্মৃতি বহন করিতেছে। কথিত আছে কেবল মাত্র তাঁহার জন্মভূমি ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য তাঁহার এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

গড়ভবানীপুরে একমাত্র মণিনাথ মহাদেব নামক শিবের মন্দির প্রাচীন যুগের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। রাজবাটীর কোনরূপ চিহ্ন এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পেঁড়ো-বসন্তপুরে এখনও একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা ভারত চন্দ্রের গড় নামে পরিচিত। কয়েক বৎসর হইল মহাকবি ভারত চন্দ্রের জন্ম স্থানে "রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র ইনষ্টিট্যুইশন" নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমতা—হাওড়াঘাট হইতে ২৮ মাইল দূর। আমতায় একটি মুনসেফী আদালত আছে। শহরটি দামোদর নদের তীরে অবস্থিত এবং একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। দামোদরের প্লাবন হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য উঁচু বাঁধ দেওয়া আছে। আমতার মেলাই চণ্ডীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। কাহারও কাহারও মতে ইহা একটি পীঠস্থান। জনশ্রুতি যে পূর্ব্বকালে মেলাই চণ্ডী দেবী দামোদর নদের অপর পারে জয়ন্তী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। বর্ষাকালে দামোদরের প্লাবনের জন্য লোকে দেবীর পূজা দিতে যাইতে পারিত না। অতঃপর দেবী একদিন তাঁহার সেবায়েতকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন যে তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন। পুরোহিত পরদিন প্রাতঃকালে একটি বটবৃক্ষ মূলে দেবীর প্রতিমা দেখিতে পান এবং সেই দিন হইতে সেই স্থানেই তাঁহার পূজা করিতে থাকেন। জনৈক বণিকের লবণ বোঝাই কয়েক খানি নৌকা দামোদর গর্ভে ডুবিয়া যায়, বণিক মানত করেন যে যদি দেবীর বরে লবণশুদ্ধ তাঁহার নৌকাগুলির পুনরুদ্ধার হয় তবে তিনি দেবীর জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। দেবীর প্রভাবে বণিকের প্রার্থনা পূর্ণ হইলে তিনি তাঁহার জন্য একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দিরটি হাওড়া জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায় যে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে (১০৫৬ বঙ্গাব্দে) ইহা নির্ম্মিত হয়। মেলাই চণ্ডীর বিগ্রহ প্রস্তর নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটি ৩৷৹ ফুট উচ্চ। এই মন্দিরের নিকটে যে শিব মন্দিরটি আছে উহা কলিকাতা হাটখোলার অধিবাসী মদনমোহন দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

আমতার নিকটবর্ত্তী **নারিট** গ্রাম সুবিখ্যাত পণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূত-পূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, মহাশয়ের জন্মস্থান। প্রধানতঃ ইহারই চেষ্টায় হাওড়া-আমতা রেলপথ খোলা হয়। এখানে "ন্যায়রত্ন ইনষ্টিটিউশন" নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে।

বড়গাছিয়া জংশন চাঁপাডাঙ্গা শাখা লাইনে জগৎবল্লভপুর, ইছানগরী ও চাঁপাডাঙ্গা উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

জগৎবল্লভপুর—হাওড়াঘাট হইতে ১৭ মাইল দূর। ইহা কাণা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটি অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। কাণানদী মজিয়া যাওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ইহা এখন ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যাইতেছে। এখানে যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি আছে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পূর্ব্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এখানে তাঁতের কাপড় ও গামছা প্রস্তুত হয়।

ইছানগরী—হাওড়াঘাট হইতে ১৮ মাইল দূর। এই স্টেশনের নিকটবর্ত্তী ঝিঁকরা গ্রামে গড়চণ্ডী দেবীর একটি বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। এখানে আরও কতকগুলি প্রাচীন মন্দির ও একটি সুদৃশ্য ও বৃহৎ মস্‌জিদ আছে।

চাঁপাডাঙ্গা—হাওড়াঘাট হইতে ৩২ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। এই স্থান হইতে হুগলী জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ পল্লী **খানাকুল-কৃষ্ণনগর** ও **রাধানগর** প্রায় ১২ মাইল দূর। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গো-যানে যাওয়া যায়। বাংলা-নাগপুর রেলপথের কোলাঘাট স্‌টেশন হইতে স্‌টীমারযোগে রাণীচক্‌ হইয়া তথা হইতে নৌকা ও মোটরবাসযোগেও কৃষ্ণনগর ও রাধানগর যাওয়া যায়। খানাকুল-কৃষ্ণনগরে বহু শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির বাস। এই গ্রামের সর্ব্বাধিকারী বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও তদীয় কৃতী পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌ চ্যান্সেলর পরলোকগত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও খ্যাতনামা অস্ত্র চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণনগর গ্রামে গোপীনাথদেবের একটি প্রকাণ্ড মন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিকে আরও অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির আছে। কৃষ্ণনগর গ্রামের সংলগ্ন রাধানগর গ্রাম ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতের বর্ত্তমান যুগের জাতীয়তার প্রধান হোতা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান। ভারতের ভাবধারা ও সংস্কৃতিতে রাজা রামমোহন রায়ের দান অসামান্য। সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাকে নবভাবের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে রাধানগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। এই বংশের কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। অতি অল্প বয়সে গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া রামমোহন পাটনায় গিয়া আর্‌বী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর কাশীতে গিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। দেশে ফিরিয়া রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণের

সহিত মনোমালিন্য হওয়ার ফলে তিনি সেই সুকুমার বয়সেই গৃহত্যাগ করেন ও নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তিব্বতে গিয়া উপস্থিত হন। তিব্বতী বৌদ্ধগণের কার্য্যকলাপ তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অর্থোপার্জ্জনের জন্য রামমোহন রংপুরের কলেক্টরি অফিসে একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজের প্রতিভাবলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হন। রংপুরে থাকিতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষা করেন এবং গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, হিব্রু ও উর্দ্দূ প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন এবং চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন ও তথায় কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহনই প্রথম মার্জ্জিত বাংলা গদ্য লেখক। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ নিজের বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য রামমোহনকে বিলাতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে "রাজা" খেতাব দেন। বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম বিলাত যাত্রী। বিলাতে অবস্থানকালে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে তিনি পরলোক গমন করেন। ব্রিষ্টলে তাঁহার সমাধির উপর এক স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায় সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন রামমোহনের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি।

হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথে বলুহাটী, চণ্ডীতলা জংশন, মশাট ও শিয়াখালা উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

বলুহাটী—হাওড়াঘাট হইতে ৮ মাইল দূর। এই স্থান হইতে দুই মাইল দক্ষিণে গয়েশপুর গ্রামে পীর গয়েস্-উদ্-দীনের আস্তানা ও মস্জিদ আছে। এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে বৃহৎ মেলা বসে। পীর গয়েস্-উদ্-দীনের গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। গয়েশপুরের নিকটবর্ত্তী নার্ণা গ্রামে এক বিখ্যাত পঞ্চানন ঠাকুর ও কালীর মন্দির আছে। লোকের বিশ্বাস যে নার্ণার পঞ্চানন ঠাকুরের মাটী মাখিলে বাতরোগ আশ্চর্য্যরূপে ভাল হয়। চৈত্র সাক্রান্তিতে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

চণ্ডীতলা জংশন—হাওড়াঘাট হইতে ১১ মাইল দূর। এই স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানেও এক প্রসিদ্ধ চণ্ডীর দেউল আছে। চণ্ডীতলা হইতে একটি শাখা লাইন তিন মাইল দূরবর্ত্তী **জনাই** পর্য্যন্ত গিয়াছে। জনাই হুগলী জেলার একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী জমিদারগণের বাস। জনাইএর

"মনোহরা" নামক মিষ্টান্ন বিশেষ প্রসিদ্ধ। জনাই হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বাক্‌সা গ্রামে একটি বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে রঘুনাথজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরটি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বাক্‌সায় ঈশানেশ্বর নামে এক বৃহৎ শিবমন্দির ও আরও দ্বাদশটি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বাক্‌সার মিত্র বংশীয় ভবানীচরণ মিত্র এই সকল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের নিকটে একটি সুন্দর পুষ্করিণী ও প্রশস্ত বাঁধা ঘাট আছে। চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে মেলা হয়।

মশাট—হাওড়া ঘাট হইতে ১৭ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। এখানে একটি অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এই শিব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। এখানে শিবরাত্রি ও চড়কের সময় উৎসব হয়।

শিয়াখালা—হাওড়া ঘাট হইতে ২০ মাইল দূর। ইহার প্রাচীন নাম শিবাক্ষেত্র। পূর্ব্বকালে এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া কৌষিকী বা কাণা নদী প্রবাহিত ছিল। শিয়াখালার উত্তরবাহিনী দেবীর মাহাত্ম্য এতদঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। জনশ্রুতি যে প্রায় চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আসেন। দৈববাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন না দিয়া এই স্থানের নদী-গর্ভ হইতে এক পাষাণ প্রতিমার উদ্ধার সাধন করিয়া নদীতীরে এক পর্ণ কুটীরে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী প্রতিমার নাম উত্তরবাহিনী। দেবী উত্তরাস্যা বলিয়াই উত্তরবাহিনী নাম। প্রবাদ জনৈক ধনী ব্যক্তি বজ্‌রায় করিয়া কাণা নদী দিয়া নৃত্যগীত উপভোগ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। গীতবাদ্যাদি শ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া দেবী মানবীর রূপ ধরিয়া তাঁহাকে নৌকা থামাইতে বলেন। ধনী তাঁহার কথা অবজ্ঞা করায় দেবী প্রতিমা কোপভরে দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে মুখ ফিরান, সঙ্গে সঙ্গে ধনীর নৌকা নিমজ্জিত হয়। দেবী উত্তরাভিমুখী হইয়া সেই ভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন বলিয়া তাঁহার উত্তরবাহিনী আখ্যা হয়। বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহের প্রধান অমাত্য বা উজীর শিয়াখালা নিবাসী গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ দেবীর একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দেবীর মন্দিরাদি তাঁহারই নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত আছে, একবার বর্দ্ধমানাধিপতি রাজরোষে পড়িয়া এই দেবীর কৃপায় সঙ্কট মুক্ত হন এবং দেবীর সেবার জন্য বহু অর্থ দান করেন। উত্তরবাহিনীর বর্ত্তমান বিগ্রহ পাষাণ নির্ম্মিত। দেবী শিবের বুকে দণ্ডায়মানা, ত্রিনেত্রা, রক্তবর্ণা ও দ্বিভুজা। এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে খর্পর; দেবীর পরিধানে বিচিত্র বসন ও ভূষণ এবং গলে মুণ্ডমালা। মন্দিরের সম্মুখে একটি